অর্থাৎ প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকার বিবাহের প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত; অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে আসুর বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অননুমোদিত—নীতিরও বিরোধী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের বহুলোক শাস্ত্র বা নীতি অপেক্ষা দেশাচারকে অধিকতর ভক্তি করেন। এইজন্য আসুর বিবাহও ভারত সমাজে গৃহীত হইয়াছে! যাহা হউক বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাবে মাতৃস্তন্য ত্যাগ না করিতেই অনেক কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত; সম্প্রদায় বিশেষে কন্যা গর্ভস্থ হইলে অথবা গর্ভস্থ হইবার পুর্ব্বে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিত। এইরূপ বাল্য বিবাহ হইতে শিশু বিধবাদিগের সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল।

এতদ্ভিন্ন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে কন্যা বিবাহ এত ব্যয়-সঙ্কুল ছিল, যে সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেন; অথচ কন্যার বিবাহ না দিলে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইত।—সম্প্রদায় বিশেষে সমাজচ্যুতি না হইলেও বড় অপমানিত হইতে হইত। এই সকল কারণে সেই সকল স্থানে সদ্যোজাতা কন্যাদিগকে বিনাশ করা হইত!—অনেক স্থলে কন্যার স্নেহময়ী জননীই স্বহস্তে এই নৃশংসোচিত কার্য্য করিতেন! তত্তৎপ্রদেশীয় রমণীকুলের জীবন যে কিপ্রকার শোচনীয় ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(২৫৯ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্বাস কাস ও রক্তপিত্ত।

১। হাঁপকাস রোগী দোক্তাতামাক মুখে রাখা অভ্যাস করিলে হাঁপকাস দমন থাকে।

২। হাঁপানী রোগীরা আফিম খাওয়া অভ্যাস করিলে সুস্থ থাকে।

৩। আদার রস ৫ তোলা, পঞ্চমুখী লাল জবা ফুলের গাছের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক। এই দুই বস্তুকে যোগ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হাঁপরোগ সময়ে, এই মহৌষধ নিত্য একবার করিয়া এক সপ্তাহ সেবিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৪। তুলসী গাছের ঘুংরী পোকা তাম্রমাদুলী করিয়া গলায় ধারণ করিলে বালকদিগের হাঁপানি রোগ আরাম হয়।

৫। কট্‌কটে বেঙের হৃৎপিণ্ডকে

চারিভাগ করিয়া একটী ভাগ কলার ভিতর পূরিয়া প্রত্যহ প্রাতে খাইলে ৪।৫ দিনের মধ্যে হাঁপ কাশি রোগী আরোগ্য হয়।

৬। একটী আরসুলা, পা গুলি ছিঁড়িয়া কলার ভিতর পূরিয়া প্রাতে ৩।৪ দিন খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়।

৭। আটটা আরসুলা এক সের জলে, মন্দ জালে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া চারিপুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে সমান পরিমাণে রেকৃটীফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া বোতলে রাখিবে। হাঁপরোগী এক কাচ্চা জলে এক ফোটা এই নিয়মে প্রাতঃকালে একবার, আড়াই প্রহরের সময় একবার সায়ংকালে একবার, ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে হাঁপ রোগ আরোগ্য হয়।

৮। মিঠা যাহাকে অমৃত বা বিষ কহে, বণিক দোকান হইতে আনিয়া চাকাচাকা করিয়া কাটিয়া গো মূত্রে ২।১ দিন ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শোধিত হইল। এই শোধিত মিঠা চারি আনা কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ দুগ্ধে পাক করণানন্তর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া এই চূর্ণ চারি আনা; এই সমস্ত দ্রব্য খলে জলদ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দিত হইলে সর্ষপ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া হাঁপ রোগীকে চর্ব্বণীয় তাম্বূলের সহ প্রতিবারে ২।৩ বটী দিবে। এই নিয়মে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর হাঁপ আরোগ্য হয়। শ্বাস রোগে রাত্রিকালীন আহার লঘু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

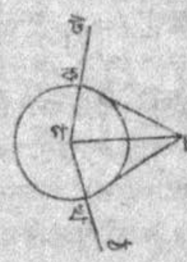
জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণ।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, প্রভৃতি আমাদিগের পৃথিবী হইতে কতদূর, তাহা অনেকের কল্পনারও অনায়ত্ত। অথচ বালক শিক্ষার গ্রন্থে পর্য্যন্ত দেখাযায়, সূর্য্য পৃথিবী হইতে এতদ্দূরে, চন্দ্র এতদ্দূরে ইত্যাদি। ছাপার লেখায় অনেক বালকের ভক্তি অচলা বলিয়া, এসকল কথা তাহারা বিশ্বাস করে; কিন্তু অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক, এসকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন দেখিয়াছি। তাঁহারা মনে করেন, এসকল আন্দাজের কথা, যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলিয়া ফেলে। প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হইতে পারে না, এইরূপই তাঁহারা মনে করেন। কি উপায়ে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হয়, অতি স্থূলভাবে সে বিষয়ে কিছু বলিব। তাহাতেই অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে দূরত্ব নির্ণয় অসম্ভব নয়।

রেল গাড়ীতে যাইবার সময় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যে গাছটি নিকটস্থ, সেটি দেখিতে দেখিতে দূরে চলিয়া যায়;

কিন্তু সেই গাছের সমসূত্রে দৃষ্ট দূরস্থ একটি গাছ, তত শীঘ্র ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না। পাহাড়ের দৃষ্টান্ত আরও উপযোগী। বনপথে হউক, অশ্বারোহণে হউক, অথবা হাঁটিয়া হউক, যে কোন প্রকারে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমনের সময়, কোন্ পাহাড় দূরস্থ কোন্‌টি নিকটস্থ, তাহা অবয়বের পরিস্ফুটতা ভিন্নও অন্য উপায়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। চলিবার সময় দুইটি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটি পাহাড় যেন ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্য একটি যে স্থানে ছিল ঠিক্ সেই স্থানেই যেন আছে; যেন একটুও অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় নাই। যে পাহাড় যত দূরস্থ, সেইটি তত এক স্থানে আছে বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর নিকটস্থ, এবং কোন্‌টি দূরস্থ, তাহা নির্ণয় হইতে পারে। আমরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির উদয় ও অস্ত প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যেগুলি অতি স্থির বলিয়া মনে হয়। যে সময় চন্দ্রকে আকাশের ঊর্দ্ধে, আমাদিগের মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়, যদি ঠিক সেই সময়ে একটা "হনুমান যন্ত্রে" চাপিয়া এক লম্ফে নিমেষের মধ্যে কলিকাতা হইতে আফ্রিকার গিনি উপকূলে উপস্থিত হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত যে চন্দ্র যেন ঠিক্ বিপরীত দিকে সেই সময়ে এক লম্ফ দিয়া প্রায় সমান পরিমাণে পিছাইয়া গেল; কিন্তু কতকগুলি নক্ষত্র যেন প্রায় যেখানে ছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল।

দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে একটি জ্যোতিষ্ককে দেখিলে, একটু বিভিন্ন বিভিন্ন দিকে সেটিকে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট বিভিন্ন দুইটি দিকের অন্তর স্থির করিলে, জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণ করা যায়। এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক:—



পার্শ্বস্থ চিত্রে বৃত্তটিকে পৃথিবী মনে করা যাউক; এবং মনে করা যাউক যে ক চিহ্নিত স্থানে একজন দাঁড়াইয়া চ নামক জ্যোতিষ্কটিকে দেখিতেছে। বলা বাহুল্য যে, জ্যোতিষ্কটি দ্রষ্টার চক্ষে ক চ রেখা ক্রমে দৃষ্ট হইবে। তেমনি যদি আর একজন খ চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া দেখে, তবে সে ঐ জ্যোতিষ্কটি খ চ রেখা ক্রমে দেখিতে পাইবে।

এখানে কচখ কোণ, বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট বিভিন্ন দিকের অন্তর। এখন

ক গ খ চ চতুর্ভুজের কোণ গুলির পরিমাণ, এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ 'গক' এর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলে, ত্রিকোণ,মিতির একটি সহজ অঙ্ক কষিয়া, কচ,খচ এবং গ চ রেখার দৈর্ঘ্য স্থির করা যাইতে পারে। যাঁহাদের গণিত শাস্ত্র জানা আছে তাঁহারা অনায়াসেই একথাটার সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন।

জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণের কৌশল বুঝাইবার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। কোনও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা করাও অসম্ভব। তবে এই দূরত্ব নিরূপণ যে সম্ভবপর ব্যাপার, তাহাই বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া গেল।

উদাসীনের চিন্তা।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং॥

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব করিওনা, কাল নিমেষে সমস্তই হরণ করে।

ভবানীপ্রসাদ নিওগী তেঁতুলিয়া গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। ভবানীপ্রসাদ শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। জননী অতি কষ্টে তাঁহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন। তিনি যৌবন কালে পদার্পণ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ সহায়-সম্পদ-বিহীন দেখিতে লাগিলেন। ভবানী প্রসাদ কলিকাতায় যাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও উপায় করিতে পারেন কি না, তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন কলিকাতায় যাইয়া কোনও সওদাগরের বাড়ীতে সামান্য কাজ করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় যাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এমন সংস্থান কিছু নাই। জননীর হাত শূন্য, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেও কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যাঁহার সহায়, তাঁহার কোন না কোন উপায় শীঘ্রই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ভবানী প্রসাদের কোনও প্রতিবেশী বিধবা গঙ্গাবাসে যাইবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যায় এমন লোক মিলিতেছে না। তিনি একদিন ভবানীপ্রসাদের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তখন ভবানীপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে কতই ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া বিধবা মহিলার সঙ্গে ভবানী-প্রসাদ কলিকাতায় আসিলেন। অচিরে তাঁহার এক সওদাগরের বাড়ী সামান্য কর্ম্ম জুটিল। ভবানী প্রসাদ মাসে মাসে যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ জননীকে পাঠাইয়া দেন, অবশিষ্টাংশ হইতে নিজের ভরণ পোষণ

নির্ব্বাহ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতেছেন। ভবানীপ্রসাদ ভদ্রবংশ-সম্ভূত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বংশ-মর্য্যাদার অনুরোধে অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিতেন না। স্বহস্তে রন্ধন এবং ভৃত্যের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে মুহূর্ত্তরেও লোক-নিন্দার ভয় কিংবা কষ্টের উদ্রেক হয় নাই। বিধাতার বিধানই চমৎকার! তিনি যাহাদ্বারা যে কাজ সম্পাদিত করাইয়া লইবেন, তাঁহাকে সে কাজ সম্পাদনের উপযোগী উপাদানেই গঠন করেন। ভবানী-প্রসাদের চিত্তে আত্যা-ভিমানের ভাবটা প্রবল হইলে, তিনি তাঁহার সামান্য আয় হইতে কখনও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। যাহা হউক ভবানী-প্রসাদ তিন বৎসর কর্ম্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এক সামান্য বোতলের দোকান খুলি-লেন। তখন আর তিনি সওদাগরের বাড়ীর কাজ রাখিতে পারিলেন না। দুই চারি মাস চলিয়া গেল, কারবার ভাপরূপ চলিতেছে না। ইহাতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তাঁহার মনে কেমন এক বিশ্বাস যে তিনি ব্যব-সায়ে বড়লোক হইবেন। এই বিশ্বাসের বলেই কখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। ফলসম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ সহজেই ধৈর্য্যশূন্য হইয়া পড়ে। এক বৎসরকাল দোকান একরূপ চলিল। দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র যেন অবস্থাচক্র ঘুরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ হইতে আশার আলোক আসিয়া ভবানী-প্রসাদের চিত্তকে আলোকিত করিতে লাগিল। দোকানে বেশ লাভ দাঁড়াইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোনও এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভবানীপ্রসাদকে কন্যাদানে প্রস্তুত হইলেন। ভবানী-প্রসাদ বিবাহ করিলেন। বিবাহে যে অর্থ পাইলেন, তাহাও দোকানে মূলধন-রূপে খাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে একপুরুষের মধ্যেই তিনি বড়লোক হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত ক্ষুদ্রচেতা লোকদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের তাহা হয় নাই। ভবানীপ্রসাদের সেই ধৈর্য্য, সেই বিনয়, সেই অধ্যবসায়, সেই নিরভি-মানিতা, সেই পরিশ্রমশীলতা সকলই রহিল। যে ভবানীপ্রসাদকে পূর্ব্বে গ্রামের লোক অবজ্ঞা করিত, সে এখন সকলের আদরের পাত্র। প্রাচীন লোকেরা এখন তাহাকে নিওগী মশায় এবং নব্য যুবকেরা ভবানী বাবু বলিয়া সম্বোধন করেন। ভবানী বাবু দানশীলতা-গুণে সরকার বাহাদুরের নিকটও বিল-ক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি রায়বাহাদুর ও একজন সম্মানিত মাজিষ্ট্রেট। ভবানী বাবুর একমাত্র কন্যা। কন্যার নাম নিরয়কুমারী। নিরয়কুমারী পিতৃগুণ কিছুই পায় নাই। মায়ের দাম্ভি-কতা, ধন ও আত্যভিমানটুকু ষোল আনা লাভ করিয়াছেন। অলসের শিরোমণি,

মুখরার হন্দ। নিরয় যখন বালিকা ছিল, তখন তাহার মধ্যে এ সকল দোষ বড় দেখা যায় নাই। প্রতিবেশী রাধাগোবিন্দ বাবুর কন্যা স্বরজা তাহার বাল্যসখী ছিল। রাধাগোবিন্দের অবস্থা ভাল ছিল না। তবুও নিরয় স্বরজাকে আপনার বোনটীর মত দেখিত। তাহার সহিত খেলা করিত। কখন কখন মায়ের অজ্ঞাতে একত্র বসিয়া আহারাদি করিত। জননী জানিতে পারিলেই এজন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেন। বাল্যস্থলভ সরলতা নিরয়ের প্রাণ অধিকার করিয়াছিল, স্বতরাং সে জননীর তিরস্কারেও স্বরজার সহিত ভগ্নীর ন্যায় মিশিতে বিরত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাব তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। স্বাভাবিক সরলতা, নিরভিমানিতা এবং সাম্যভাব ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। জনক জননীর কুশিক্ষায় অনেক বালক বালিকার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। নিরয়কুমারীর জীবন তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। নিরয়কুমারী এখন আর স্বরজাদের বাড়ী যায় না, স্বরজার সঙ্গে কথা বলা অপমানজনক মনে করে। স্বরজাকে দেখিলে পার্শ কাটিয়া চলিয়া যায়। স্বরজাও সাহস করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হয় না। নিরয়কুমারীর বয়স এখন দশ বৎসরের অধিক নয়। তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু আর যখন সন্তান হইবার আশা নাই—তখন নিরয়কুমারীর বিবাহ দিয়া জামাইকে গৃহে রাখেন ইহাই ইচ্ছা। অথচ মৃত্যুর পর পিণ্ড প্রাপ্তির আশা প্রাণ হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না। তাই এক একবার পোষ্যপুত্র গ্রহণেরও আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে পোষ্য পুত্র গ্রহণ কামনা পরিত্যাগ করিলেন। জামাইকে গৃহে রাখিতে হইলে বর মূর্খ ও দরিদ্র না হইলে চলিবে না, কারণ বর শিক্ষিত লোক হইলে শ্বশুরের গৃহে চিরকাল থাকিবেন প্রত্যয় কি? ধনী হইলেও কেহ এরূপ জীবন কাটাইতে সম্মত হইবে না। এজন্য ভবানী বাবু এক মূর্খ দরিদ্রের সন্তানকে কন্যার বর মনোনীত করিলেন। বরটী দেখিতে সুশ্রী ছিল বটে, কিন্তু অন্তঃসার-বিহীন। নিরয়কুমারীর পক্ষেও এরূপ বরই আদরণীয়, কারণ সে তাহাকে কলুর বলদের মত যথেচ্ছা ঘুরাইতে পারিবে। বিবাহের পর পাঁচ বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু তৎপরে প্রতিকূল বায়ু বহিতে লাগিল। ভবানী বাবু পদ্মা নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদার হইবার ইচ্ছা এত প্রবল যে ঐ সম্পত্তি ক্রয়কালে ১॥ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। ঋণের স্থদ ক্রমশঃ পুঞ্জীকৃত হইতে লাগিল। এদিকে ব্যবসায়ের অবস্থাও তত ভাল নয়। লাভ আর পূর্ব্বের মত হইতেছে না। কিয়ৎকাল এইরূপে চলিতে লাগিল। পদ্মানদী অতি ভীষণ। যাঁহারা তাহার

মহিমার বিষয় জানেন, তাঁহারা সহজে তাহা ভুলেন না। বৎসর বৎসর কত গ্রাম অট্টালিকা—কত গৃহস্থপল্লী উদরসাৎ করিতেছে! ইহার প্রভাবে কত জমিদার দুই তিন বৎসরের মধ্যে ফকির হইয়া পড়িতেছে! ভবানী বাবুরও সে দুর্গতি ঘটিল। পদ্মানদীর প্রকোপ তাঁহার জমিদারীর উপর পতিত হইল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারী সমস্ত পদ্মা গর্ভে নিখাত হইল। এখন তিনি ঋণজালে জড়িত। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিপদ একাকী আসে না। চতুর্দ্দিক হইতে যেন বিপদরাশি মুখবিস্তার করিয়া তাঁহার সুখচন্দ্রমা গ্রাস করিতে আসিতে লাগিল। কন্যা নিরয়কুমারী চিররুগ্না হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী বাতব্যাধি রোগে শয্যাশায়িনী। এদিকে উত্তমর্ণগণ ঋণ শোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ভবানী বাবু আর কোনও পথ না পাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। উত্তমর্ণগণ এই সংবাদ পাইয়া অমনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ করিল। নিরয়কুমারীর আর এখন উচুমুখে উচু কথা নাই—ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী এক পাখীর দলে জুটিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে যে নিরয় রাজকুমারী ছিল, আজ সে পথের কাঙ্গালিনী। এমন কি উত্তমর্ণগণ বসত বাড়ী খানি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এখন নিরয়কুমারী এবং তাহার জননী যান কোথা? সুরজা এই সংবাদ শুনিতে পাইল। সুরজার পিতা নির্ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু সুরজা এক ধনী জমিদারের হাতে পড়িয়াছে। তাহার স্বামীর বিপুল সম্পত্তি। কিন্তু এতাদৃশ সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও সুরজার মস্তক ঘূর্ণায়মান হয় নাই। তাহার প্রকৃতি অধিক পরিমাণে ভবানী বাবুর প্রকৃতির মত ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তনসহ তাহার চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। সুরজা নিরয়ের দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবে স্থির করিল। কিন্তু অভিমানী নিরয় তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবে কি না এই সন্দেহ তাহার মনে উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল সন্দেহে দোলায়মান অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে সুরজা সাহায্যের প্রস্তাব করাই স্থির করিল। সুরজা স্বয়ং এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য পিতৃগৃহে চলিয়া আসিল। তাহার স্বামীও উদারচরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সুরজার সাধু সংকল্পে বিঘ্ন না জন্মাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করিলেন। সুরজা পিতৃগৃহে আসিয়া ভবানী বাবুর বাড়ীতে গেল। সুরজাকে দেখিয়া নিরয়ের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, আর সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল সুরজার সঙ্গে বাক্য বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। শোকাবেগ কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সুরজাকে

বলিল, এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য স্বরজার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিরয়ের এই অবস্থা দেখিয়া স্বরজাও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না—অবশেষে নিরয়ের পিতার আংশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া বসতবাড়ী খানি মুক্ত করিবার প্রস্তাব করিল। নিরয়ের আর এখন সে অভিমান নাই। বিপদের ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, সুতরাং স্বরজার প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা গ্রহণ করিতে রাজী হইল। উত্তমর্ণদিগের কেহ কেহ স্বরজার এই মহত্বের কথা শুনিয়া আংশিক টাকা গ্রহণ করিয়াই নিরয়কে ঋণ মুক্ত করিয়া দিলেন। নিরয় এখন স্বরজার অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদনের এবং বাসগৃহাভাবের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। ধন্য স্বরজা!!! তোমার মহত্ত্ব সকল মহিলারই অনুকরণীয়।

উপসংহারে ভগিনীদিগকে প্রস্তাবের শিরোভাগস্থিত শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিধাতার বিধি বুঝা ভার, ভবিষ্যতের গর্ভে কার জন্য কি নিহিত থাকে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। তাই ক্ষুদ্রমনা লোক ভিন্ন কেহ কালের ক্রীড়ার বস্তু ধনমানের গর্ব্ব করে না। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই ধন, জন এবং যৌবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন, এজন্য তাঁহারা কখনও গর্ব্বিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই তৃণের মত নীচু হইয়া থাকেন। প্রত্যেক নরনারীর এতাদৃশ আদর্শের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জীবন মধুময় হইবে।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

শেষ।

দাস দাসীগণকে পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাদের সহিত ইয়ারকি দেওয়া বা পরিহাসাদি করা কর্ত্তব্য নহে এবং তাহারা যেখানে গ্রাম্য পরিহাস ও গল্পগাছা করে, তথায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের প্রতি জননীর ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিবে। তাহাদের পীড়া হইলে চিকিৎসা করাইবে—চিকিৎসককে টাকা দিবে এবং পীড়িতের শুশ্রূষা করিবে। রোগী ভাল হইলে যদি তোমার আর্থিক অভাব থাকে, তবে না হয় তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লইবে, কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে মারা গেলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। তাহারা মনোনীত না হইলে জবাব দেওয়া ভাল, কিন্তু গালি গালাজ দেওয়া উচিত নহে। গৃহে কোন উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত হইলে অন্যান্য পরিবারগণের ন্যায় উহাদিগকেও দেওয়া

উচিত। গৃহিণীর নিকট মাতার ন্যায় স্নেহ ও শাসন প্রাপ্ত হইলে উহারাও সন্তানের ন্যায় ভক্তি ও ভয় করিয়া গৃহের কার্য্য গুলি নিজের কার্য্যের ন্যায় মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিবে এবং ঐ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিবে না।

গাভীগণ হিন্দুদিগের মাতার ন্যায় পূজ্যা। আমরা ইহার অর্থ যেটুকু বুঝিতে পারি, তাহা এই যে গাভীদুগ্ধ সুপের ন্যায় মনুষ্যশরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। যে সকল শিশু অন্ন অথবা তদ্রূপ কোন জিনিষ ভক্ষণ করিতে পারে না এবং যে শিশুগণ স্তন্যে বঞ্চিত, গাভীদুগ্ধ তাহাদের জীবন স্বরূপ। গাভীদুগ্ধে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্য কিছু আহার না করিয়াও এক গাভীদুগ্ধে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে সমর্থ; তদ্ভিন্ন যাগযজ্ঞ হোম বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে গাভীদুগ্ধ ও ঘৃত একটী প্রধান সামগ্রী। এমন উপকারিণী গাভীকে মাতৃস্থানীয়া করিয়া হিন্দুগণ কেমন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন! গাভীগণ অতি নিরীহস্বভাব এবং উদ্ভিদ ভক্ষণেই জীবন ধারণ করে—হিংসা প্রবৃত্তি ইহাদের আদৌ নাই, সুতরাং এই সুন্দর স্বভাবাপন্ন জীবকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুগণ কেন কুণ্ঠিত হইবেন? গাভীর বিষ্ঠা মূত্রও গৃহস্থের অনেক উপকারে আইসে। গার্হস্থ্যধর্ম্মপরায়ণা গৃহিণীগণ এই গাভীকে অতি ভক্তির সহিত যত্ন ও পালন করিবেন। এইরূপ যে পশুগণ আমাদের উপকারে আইসে এবং আমাদের প্রতিপাল্য, তাহাদের যত্ন ও তত্বাবধান করা রমণীর কর্ত্তব্য। গৃহপালিত পক্ষীগুলির প্রতিও যত্ন চেষ্টার ত্রুটী হওয়া উচিত নহে। স্বাধীনতাবঞ্চিত পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণ যদি গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিয়া অনাহারে অযত্নে মরিয়া যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে কি তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না? যদি না হয় তবে তুমি হৃদয়হীনা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনের যোগ্যা নও। অতএব গৃহপালিত পক্ষীদিগকে জননীর ন্যায় আহার প্রদান করিবে ও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে। "প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥" এই উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া চলিবে।

স্বাস্থ্য যখন সকল ধর্ম্মের, সকল কর্ম্মের, ও সকল সুখের মূল, তখন রোগীর শুশ্রূষা দ্বারা যদি তুমি তাঁহাকে স্বাস্থ্য দিতে পার তবে রোগীকে কি না দিলে? পথ্যাভাবে ঔষধ, রোগীর কোন উপকার করে না। ঔষধাভাবে পথ্যদ্বারা রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পথ্যাভাবে বাঁচিতে পারে না,—"যা না করে বৈদ্য তা করে পথ্য" এই কথাটি অতি সার। সুতরাং পথ্যাদিদ্বারা রোগীর শুশ্রূষা করাও গার্হস্থ্যধর্ম্মের অন্তর্গত।

এখন আর তপোবন নাই—সংসার-

ত্যাগী, ফলমূলাহারী সংযতেন্দ্রিয় বনবাসী আর্য্য ঋষিগণও নাই এবং সহমরণ প্রথাও নাই, সুতরাং বিধবাগণকে যখন গৃহে থাকিয়াই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে, তখন সধবা রমণীকেও ঈশ্বর এবং পতি পদে মতি রাখিয়া উক্ত প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সধবা রমণীগণের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণে তাঁহাদের প্রভেদ এই যে তাঁহারা নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তভাবে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। একদা মহামুনি বশিষ্ঠ, ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ॥"

হিন্দুবিধবাগণেরও এইরূপে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা উচিত। পরিজন অতিথি ও গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত না করিলে তাঁহার ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজাঃ। যৎস্যাদ্ধারণপ্রযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"

সতীধর্ম্ম যে কেবল মাত্র স্বামীকে লইয়া তাহা নহে, তাহা হইলে স্বামীর চাকরীস্থানবাসিনী—শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর প্রভৃতিকে অবজ্ঞাকারিণী—পরিজনগণের সহিত কলহপ্রিয়া—পরিজনদিগের মধ্যে কেহ গলা শুকাইয়া মরিলেও এক বিন্দু জল না দিয়া, বাবু (স্বামী) আসিলেই মিছরী ভিজা ও খাবারাদি লইয়া যাঁহারা হাজির থাকেন, তাঁহারা কি পবিত্র সতী নামের যোগ্য? কখনই নহে। শাণ্ডিলী নাম্নী একটী সতীরমণী স্বর্গে গমন করিলে স্বর্গবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! তুমি কি পুণ্যে এত উচ্চ স্বর্গে আসিয়াছ? ইহার উত্তরে শাণ্ডিলী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত সতীধর্ম্ম—তাহাই হিন্দুরমণীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, এইজন্য শাণ্ডিলীর সেই সুধাময় নীতিপূর্ণ বাক্যগুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা ॥
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবং ॥
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্ত্তিনী ॥
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈত মনোগতং।
অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ ॥
অসদ্বাহসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা ॥
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনে নোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা ॥
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং ॥
কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু।
প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং কারয়ামি করোমিচ ॥
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেন চিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা ॥
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানমাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনাঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি ॥
নোত্থায় যামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
অন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু তেষু তুষ্যতি মে মনঃ ॥
নায়াসায়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেপি সর্ব্বদা।
গুপ্ত গুহ্যা সদাচাস্মি স সংসৃষ্ট নিবেশনা ॥

তৎপরেই বলা হইয়াছে যে, "যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখভোগ করেন। শ্রীকুমুদিনী রায়।

কোরিয়া প্রদেশের মহিলা।

পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন কিছুকাল হইতে কোরিয়া প্রদেশ লইয়া চীন ও জাপানের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। জাপান বলেন ন্যায়তঃ কোরিয়া রাজ্য তাঁহারই অধিকারভুক্ত, কিন্তু চীন জাপানের এই দাবী অস্বীকার করেন। কোরিয়া রাজ্যের উপর কে আধিপত্য করিবেন, তাহাই মীমাংসার জন্য বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কোরিয়া প্রদেশ সভ্যজগতের নিকট এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল।

চীন-জাপান সমর আরম্ভ হওয়া অবধি কোরিয়া প্রদেশ সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব অবগত হইতে সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ কোরিয়ার মহিলাগণের অবস্থার বিষয় জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহলাক্রান্তা হইতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।

কোরিয়াদেশীয় মহিলাগণের জীবন বহুলাংশে চীনমহিলাগণের জীবনের আদর্শে গঠিত। কোরিয়ার সামাজিক ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীলোক পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন। সেখানে বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। যে পুরুষ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, তাঁহাকে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক একটী পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক বাটীতে বহু স্ত্রী লইয়া বাস করার প্রথা কোরিয়াবাসিগণ ঘৃণনীয় বিবেচনা করেন। চীন ও জাপানীয় রমণীগণ সাধারণতঃ রূপলাবণ্য-বিশিষ্টা, কিন্তু কোরিয়া মহিলাগণের মধ্যে অনেকেই সৌন্দর্য্য-বিরহিতা। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বিবেচনায় কোরিয়ার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ অতীব কুৎসিতা। ভারতবর্ষের ন্যায় কোরিয়ার নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ রাজপথে বাহির হইতে সঙ্কুচিতা হয় না, কিন্তু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা থাকেন। নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা রাজপথে বহির্গতা হন, তাঁহারা মস্তক ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করেন, এবং তাহাতে কেবল চক্ষুদ্বয়ের উপযোগী দুইটী ছিদ্র রাখিয়া দেন। কোরিয়া প্রদেশে সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালিকাগণ বালকদিগের সহিত একত্র ক্রীড়া করে এবং বালকদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। এখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিলেই কোনও বালিকাকে কোনও বালকের সহিত আর বাক্যা-

লাপ করিতে দেওয়া হয় না এবং অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। কোরিয় মহিলাগণের পরিচ্ছদ কতকটা ভারত-বর্ষের পশ্চিম প্রদেশীয় কোন কোন স্থলের রমণীগণের পরিচ্ছদের অনুরূপ। কোরিয়া প্রদেশে ধুতী বা সাড়ী ব্যবহৃত হয় না। স্ত্রীলোকগণ পাজামা পরিধান করেন; কিন্তু একটী পাজামা পরিধান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট নহে; উপর্য্যুপরি তিনটী পাজামা পরিধান না করিলে তাঁহারা দেশাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করারূপ অপরাধে অপরাধিনী হন। পাজামার উপরে পিরাণের ন্যায় একটী গাত্রাবরণ পরিধান করিতে হয়; উহা রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক। গাত্রাভরণে পকেট না থাকাতে, ইঁহারা একটি থলিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহা কোমরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

কতকগুলি সুমাতা।

(৩৫৭ সংখ্যা-১৮২ পৃষ্ঠার পর)

মাতাই সন্তানের আদিগুরু। প্রকৃতি হইতে শিশু যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তৎপরেই জননীর নিকট শিক্ষিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর গৃহই প্রধান শিক্ষা-গার। এই গৃহে যদি সুখশান্তি, পবিত্রতা, বিশুদ্ধ আমোদ থাকে এবং আদি-গুরু জননী যদ্যপি সুশিক্ষিতা উচ্চহৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে উদ্যান-জাত সুগন্ধ কুসুমের ন্যায় শিশুচরিত্র পরিণামে সুগন্ধ ও মধুময় হইয়া জনক জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ শিশুচরিত্র বিশুদ্ধ; কিন্তু পাত্র-ভেদে লবণ যেমন তিক্ত হইয়া পড়ে, জননীর দোষগুণে শিশুগণ তেমনি বিগড়াইয়া যায়। ক্ষুদ্র শিশু যে অবাধ্য হয় বা মিথ্যা বলে, সে কাহার দোষ? তাহার না তাহার শিক্ষাদাত্রী জননীর? পূর্ব্বকালে মাতা শিশুকে যদ্রূপ শিক্ষা দিতেন শিশুগণ সেইরূপ আচরণ করিয়া যশস্বী হইতেন। নিম্নলিখিত জননীদ্বয়ের চরিত্র-দ্বারা বুঝা যাইবে কিরূপ শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সুমিত্রা—রামায়ণবর্ণিত সুমিত্রা দেবী এক আদর্শ মাতা। প্রাণাধিক পুত্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। আদর্শ মাতা আরণ্য গমনোদ্যত পুত্রকে বলিতেছেন;—

> সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে;
> রামপ্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি।
> ইদংহি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম;
> দানং দীক্ষাচ যজ্ঞেষু তনুত্যাগ মৃধেষু হি।

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্;
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্।

"হে পুত্র! বনবাসের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তোমাকে বনগমনে আদেশ দিতেছি। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি, তুমি ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সমরে দেহত্যাগ ইহাই এ বংশের ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিবে।" সুমিত্রাদেবী প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণের শিরোঘ্রাণ করতঃ সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন "বৎস! তবেএ থন তুমি সচ্ছন্দে শ্রীরামের সহিত অরণ্যচারী হও।" সুমাতার নিকট সাধুবাক্যে উৎসাহ পাইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মণ অযোধ্যার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী এবং যৌবন-তৃষ্ণা পরিহার করিয়া জটা অজিনধারী ব্রহ্মচারী হইতে পারিয়াছিলেন। সুমিত্রা সতী ভাবাবেগ রুদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন,তাই পরিণামে ইন্দ্রজিৎ-জয়ী বীর লক্ষ্মণের জননী হইয়াছিলেন এবং আদর্শ দেবতা হইয়া অদ্যাপি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তি গ্রহণ করিতেছেন।

কুন্তীদেবী-যদুবংশের শূরসেন রাজার দুহিতা। যদুবংশের ভাগিনেয় ভোজরাজ কুন্ত অপুত্রক থাকায় শূরসেন-নৃপতি নিজ কন্যাকে তাঁহার নিকট লালনপালনার্থে দিয়াছিলেন। শূরসেন-তনয়া সে সময় পৃথা নামে অভিহিত হইতেন। পরে ভোজ-রাজ কুন্ত নিজ নামানুসারে কুন্তী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশীল কুন্ত নৃপতি দুহিতা কুন্তী দেবীকে অতিথিপরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় কুন্তী দেবী দুর্ব্বাসাপ্রসাদাৎ "অভীষ্ট মন্ত্র" পাইয়াছিলেন। মহাবংশে মহারাজ পাণ্ডুর সহিত কুন্তীদেবীর বিবাহ হইয়া-ছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণ এক এক জন পরাক্রান্ত বীর, তথাচ তিনি এক দিনের জন্যও অহঙ্কার করেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণা কুন্তী দেবী ধর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তাই মাদ্রী দেবী নিজ সুতগণকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া গর্ভজাত পুত্রাপেক্ষা নকুল সহদেবকে অধিক স্নেহ করিতেন। বন-বাস গমনকালে কুন্তী দেবী সপত্নী-পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন;—

"ওরে পুত্র সহদেব! ফিরে চাহ মোরে।
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলে অন্তরে॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
ভাই সব যাক যদি না পারে রহিতে।
সবে যাক্ তুমি থাক আমার সহিতে॥"

যখন কুন্তী দেবী দেখিলেন সহদেব ভ্রাতৃগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, সক-

সেরই বনবাসে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, তখন বধূকে বলিতেছেন ;—

না করহ আন, ভাবী নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধু কর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য ভিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ, যাইতেছে বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভাল মতে।
সহজে বালক, বনে মহা দুঃখ,
সদা দেখিবে স্নেহেতে।
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি।'

কুন্তীচরিত্রে, এই এক মহত্ব। আপনাকে ভুলিয়া পরকে ভালবাসা এই ত অসাধারণ মহত্ব। জননী মাত্রেই প্রাণাপেক্ষা গর্ভজাত তনয়কে স্নেহ করেন। সপত্নী-তনয়ে যাহার এতাদৃশ প্রেম, না জানি তাঁর ভালবাসা কতই ছিল! আর এক স্থলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন বর প্রদান করিতে চাহিলেন, সেই সময় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীকে বলিতেছেন "হে মাতঃ আপনার গুণেই আপনার পুত্রগণ জয়লাভ করিয়া সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইলেন। আমি আপনারও আপনার পুত্রগণের গুণে একান্ত বশীভূত ও প্রীত হইয়াছি, এখন আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন!" ধর্ম্মপরায়ণা কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া একান্ত বিনয় সহকারে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "তাত! এ সংসারের ধন সম্পদ কিছুই নহে, অকিঞ্চিৎকর দুষ্ট বস্তু মাত্র। ইহা ভোগতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তিকুলকে বর্দ্ধিত করিয়া মানবকে বিনাশের পথে চালিত করে। সুখেচ্ছা বর্দ্ধিত ও অসংযত হইয়া মানব অহঙ্কৃত হয় এবং মত্ত হইয়া তোমার দেবদুর্ল্লভ চরণারবিন্দকে* তুচ্ছ করিয়া থাকে। হে বৎস! যদি একান্তই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক, তবে দুঃখই পুনরায় প্রদান কর, কারণ দুঃখের অবস্থায় তোমাকে স্মরণ ও তোমার উপর নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তোমাকে বিস্মৃত ও তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য হওয়াই মৃত্যুর অবস্থা। হে কৃষ্ণ! এই অবস্থা হইতে আমাকে ও আমার প্রাণাধিক পুত্রগণকে রক্ষা কর। কুন্তী দেবীর চরিত্রে উদারতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, নির্ভরশীলতা, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি একাধারে বিরাজমান। এমন প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ জননী না হইলে কি পাণ্ডবগণ এতদূর শক্তিশালী হইতে পারিতেন? কখনই না। যে যত মহৎ হউক না কেন, মূলে জননীর শক্তি। কুন্তীর ঐ সকল গুণ এক একজন পাণ্ডবের চরিত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

সুশীলাবালা সিংহ।

---

* কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

ইয়োরোপীয় নাবিকদিগের কয়েকটী কুসংস্কার।

কোন অর্ণবপোতে শব লইয়া গেলে সেই অর্ণবপোতের ভবিষ্যতে অমঙ্গল হইবে।

দ্রুতগামী অর্ণবপোতের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিবে।

ঝটিকার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে যদি কোন অর্ণবপোতারোহী কেশ মুণ্ডন বা নখ কর্ত্তন করেন, তাহাহইলে সেই অর্ণবপোতের বিপদ ঘটিবে।

অর্ণবপোতস্থ মূষিকগণ যদি তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাহইলে অল্প-কালের মধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হইবে।

জাহাজ ছাড়িবার সময় যদি আরোহী-দিগের মধ্যে কেহ বামদিকে ফিরিয়া হাঁচিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাহা বড় অশুভকর।

যদি অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করাই-বার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী শূকরশাবক হনন করিলে, কিম্বা জাহা-জের মাস্তলে একটী ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া রাখিলে উক্ত বাসনা পূর্ণ হইবেক।

পেট্রেল নামক পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইলে ঝটিকা ও বৃষ্টিপাত হইবে এবং অক্-পক্ষী নয়নপথে পড়িলে শীঘ্র গম্য স্থানে পৌছান যাইবেক।

জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রবারি মধ্যে বিড়াল নিক্ষেপ করিলে শীঘ্রঝটিকা হইবে

সমুদ্রের যে সকল স্থলে কোন অর্ণব-পোত পূর্ব্বে জলনিমগ্ন হইয়াছে এরূপ প্রবাদ আছে, সেই সকল স্থলে জলমগ্ন পোতারোহীদিগের প্রেতাত্মা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরেই আত্মঘাতী-দিগের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। ষ্টোয়িক (কৃচ্ছ্র সাধক) সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রীকদার্শ-নিকগণ আত্মহত্যা প্রশংসাজনক বিবে-চনা করিতেন। রোমান্ ব্যবস্থাপক-দিগের মতে আত্মহত্যা দোষ বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় শিক্ষিত ও ধনবান্ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই আত্মহত্যা অধিক সংখ্যায় ঘটিয়া থাকে। ইয়ো-রোপে স্ত্রীলোক আত্মঘাতিনীদিগের মধ্যে অনেকেই বিষপান, উদ্বন্ধন, অনা-হার, প্রভৃতি উপায়ে কিম্বা অস্ত্রদ্বারা গলদেশচ্ছেদন করিয়া আত্মহত্যা করেন। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ করিবার তিন শত বৎ-সর পূর্ব্বে রোমান্‌দিগের মধ্যে শ্মশ্রু মুণ্ডন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথম দিন শ্মশ্রু মুণ্ডন করিবার সময় মহোৎসব করিবার রীতি রোমান্‌দিগের মধ্যে প্রচ-লিত ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন ঐ

দিন হইতে তাঁহারা প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পন করিয়া সংসারে প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ করিলেন।

টিন্‌টোরেটো নামক ইতালীয় চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত "স্বর্গ" নামক চিত্রের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি চিত্র পৃথিবীতে আর নাই। এই চিত্রখানি ৮৪ ফিট্‌ প্রশস্ত এবং ৩৩$\frac{1}{2}$ ফিট উচ্চ। ইহা এক্ষণে বিনিস্‌ নগরের "ডোজেস্‌ পেলেস্‌" চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌দিগের মধ্যে বৃক্ষের দীর্ঘতা লইয়া আলোচনা হয়। তৎকালে প্রতিপন্ন হয় যে ভিক্টোরিয়া প্রদেশে ৪২৫ ফিট দীর্ঘ যে বৃক্ষ নয়নগোচর হইয়াছিল, তদপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ আর কুত্রাপি নাই।

ইয়োরোপবাসিগণ বর্ষে বর্ষে বিবাহ দিবসের সাংবৎসরিক উৎসব করিয়া থাকেন। প্রথম বাৎসরিক উৎসবকে ইহারা লৌহময় বিবাহ আখ্যা প্রদান করেন, এবং তদনুসারে পঞ্চম বাৎসরিক উৎসবকে কাষ্ঠময়, দশম বাৎসরিক উৎসবকে টিনময়, পঞ্চদশ বাৎসরিক উৎসবকে স্ফটিকময়, বিংশ বাৎসরিক উৎসবকে কাচময়; পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক উৎসবকে রৌপ্যময়; ত্রিংশ বাৎসরিক উৎসবকে তুলাময়; পঞ্চত্রিংশ বাৎসরিক উৎসবকে বস্ত্রময়; চত্বারিংশ বাৎসরিক উৎসবকে উর্ণাময়; পঞ্চচত্বারিংশ বাৎসরিক উৎসবকে রেশমময়; পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসবকে স্বর্ণময়; এবং পঞ্চসপ্ততি বাৎসরিক উৎসবকে হীরকময় বিবাহ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে তাহা ঘণ্টায় কত মাইল গমন করিতেছে, তাহা জানিবার একটী সহজ উপায় আছে। একটী রেলের সহিত অপর একটী রেলের যেখানে সংযোগ আছে, সেই স্থানের উপর দিয়া গাড়ী যাইবার সময় একটী বিশেষ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে যতবার ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে, রেলগাড়ী প্রতি ঘণ্টায় সেই সংখ্যক মাইল যাত্রা করিতেছে স্থির করিতে হইবে। এই গণনা সকল রেলগাড়ীর সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৬এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা উপাধি বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। এবার ছোটলাট ও জষ্টিস গুরুদাস বাবু সভাধারে বসেন এবং বাইস চান্সেলর সার আলফ্রেড ক্রফট ডিগ্রী পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে উপাধি দান করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি ইংরাজ ও বঙ্গমহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম দ্বিতীয় বার এম এ এবং কুমারী হেমপ্রভা বসু ও সরলা রক্ষিত বি এ উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন।

২। ৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। প্রতিনিধি দ্বারা মহারাণীর বক্তৃতা পঠিত হয়।

৩। হচিং নামক স্থানে চীনজাপানীগণের মধ্যে আবার এক মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে চীনেরা পরাভূত হইয়াছে; চীনদিগের ১০০০ এবং জাপানীদিগের ৪০ জন মাত্র সৈন্য হত হইয়াছে।

৫। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ সার টী মধুস্বামী আর কে, সি, আই, ই পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারতমাতা একটী উপযুক্ত সন্তান হারাইলেন। সুব্রহ্মণ আর সি আই ই ইহাঁর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড চর্চ্চহিলের মৃত্যু হইয়াছে।

৭। প্রশান্ত মহাসাগরের হাবাই দ্বীপের রাজ্ঞী লিলুকো:কেলানিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তথায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়, দেশবাসীরা পুনরায় তাঁহাকে পদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

৮। জর্ম্মণীতে বিড়ালের ট্যাক্স হইয়াছে।

৯। আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৮ই এফ এ ও বি এ পরীক্ষা বসিবে। ১৮৯৬ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৭এ জানুয়ারী এবং এফ এ, বি এ পরীক্ষা ৬ই ফেব্রুয়ারি বসিবে।

১০। পারস্যদেশে কুচান নগরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১১। মেথডিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগের এক বৈদেশিক প্রচার সভা আছে, তাহার শাখার সংখ্যা ৬১২৮ এবং সভ্য সংখ্যা দেড় লক্ষেরও অধিক। ইহাঁরা গত এক বৎসরে ধর্ম্মবিষয়ে ৫০ পৃষ্ঠা লেখা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

বামারচনা।

দেবঘর।

"সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি"

১

শ্যামল সুন্দর ছটা চারু তপোবন—
স্বরগ বাতাস চুমি
আরামে পড়িছে ঘুমি,
কানন, প্রান্তর, গিরি, পশু, পাখিগণ!
মানবের বুকে বুকে,
কোটী জনমের সুখে,
খুলিয়া যেতেছে যেন সুধা প্রস্রবণ!
বিভল পরাণ মন,
সচেতনে অচেতন,
অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিছে ভুবন!
নয়নে জাগিছে শ্যাম চারু তপোবন!

২

এদেশে বহেনা বুঝি মরতের বায়,
এখানে মুহূর্ত্ত-পরে,
ফুল বুঝি নাহি ঝরে,
চাঁদিমা ঢাকেনা মুখ তামসী নিশায়?
আসি এই রাজাসনে,
(মলয়-সুপ্তদ-সনে)
বসন্ত,ছু'দিনে বুঝি ফিরে নাহি যায়?

এই খানে চির তরে,
পাহাড়ের স্তরে স্তরে,
বরষা উছলে বুঝি শত ফোয়ারায় ?
ধরার বিষাক্ত বায়ু
হরে যে জীবের আয়ু,
সে কভু এ দেব-দেশ ছুঁইতে না পায় !
এখানে বহেনা কভু মরতের বা'য় !

৩

বিরাজিছে "তপোগিরি" দেব-সৌধ বৎ—
স্নেহ কোল প্রসারিত,
জুড়া'তে শ্রান্তের চিত,
গড়িলা কি বিশ্ব কারু শত শৃঙ্গ রথ !
ও বরাঙ্গে মধু মাসে
কচি কিশলয় ভাসে,
কনক কেতন রাঙ্গা, মাতায় জগৎ !
এদিকে তুলিয়া কর
"নন্দন" ভূধর বর,
দেখায় পথিকে ডেকে ত্রিদিবের পথ !
এ দেশের সব যেন দেব-চিত্রবৎ !

৪

নিরমল শশী তারা জাগিছে আকাশে,
দেব মন্দিরের মাঝে,
শত শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
দ্রবীভূত পবিত্রতা "শিব-গঙ্গা" ভাসে !
কোটী কণ্ঠে ডাকে নর,
"বম্ বম্ হর হর"
দিগন্ত প্লাবিত করে একই নিশ্বাসে !
পুণ্য, শান্তি, পবিত্রতা,
নরে দিতে অমরতা,
ছাড়ি সে অমরাবতী ভবে নেমে আসে,
তারি সাক্ষী তারা শশী জাগিছে আকাশে !

৫

সসীম মানব-প্রাণে "অসীম" উদয়,
অসীম অনন্ত শক্তি,
অসীম অনন্ত ভক্তি,
অসীম অনন্ত দেবে পূরিত হৃদয় !
খুলি হৃদি খুলি মন,
আয় ডাকি, ভাই বোন,
"জয় অনাথের নাথ, বৈদ্য নাথ জয় !"
মুছি অশ্রু-মাখা আঁখি,
প্রাণ ভরে সবে ডাকি—
কোমল দুর্ব্বল কণ্ঠ তাহে নাহি ভয় !—
শিশুর করুণ ডাকে,
স্নেহে মা ছুটিয়া আসে,
এক ফোঁটা অশ্রু পড়ি ভিজে বিশ্বময় !
অনন্তে—দিগন্ত প'র,
এ আকুল দীন স্বর
উঠিবে, মিলিবে সেই চরণে আশ্রয়—
আয় ডাকি, ভাই বোন, ডাকিতে কি ভয় ?

৬

ধন্য তুমি পুণ্যভূমি, ধন্য দেব ঘর,
ধন্য তুমি মহাতীর্থ,
তোমার বাতাসে চিত্ত,
মন্দাকিনী-স্নাত যথা পূত কলেবর !
ভূধর, নির্ঝর, তব
অতুল সুন্দর সব,
প্রকৃতির লীলাগৃহ, এ বন প্রান্তর !
নগর কি রাজালয়,
এ মাধুরী—কোথা নয়,
(কার এ উদার প্রাণ সরল সুন্দর ?)
সেথা যে গরজে কাজে,
বেহাগ ভৈরবী বাজে !—
সেথা বাঁশি অর্থ দাসী, সদা স্বার্থপর !
তুমি মা আনন্দধাম,
বুকে ভরা শিব নাম,
সাধক-হৃদয় তুমি দেবতার ঘর !
জনতায় পরিহরি,
তাপসীর বেশে মরি,
লুকি আছ শান্ত, স্নিগ্ধ, আশ্রম ভিতর !
তাই তুমি নিরুপম,
মায়ের অঞ্চল সম,
স্নেহ মমতার গঙ্গা, সুখের নির্ঝর !
হেন মনে সাধ করি,
এ সৌন্দর্য্যে ডুবে মরি,
এক পলে হয়ে যাক্ কোটী জন্মান্তর !
ধন্য তুমি পুণ্যভূমি, ধন্য দেব ঘর।

শ্রী কাব্য কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬২ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩০১—মার্চ্চ ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জন্মমৃত্যু—পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৭০, প্রতিদিন ১ লক্ষ ৮ শত এবং প্রতি বৎসর ৩ কোটী, ৬৮ লক্ষ লোকের জন্ম হয় এবং প্রতি মিনিটে ৬৮, প্রতিদিন ৯৭, ৭৯০ ও প্রতি বৎসর ৩ কোটী, ৫৭ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। মিনিটে জাত ৭০টীর মধ্যে ২টী সন্তান বাঁচে, তাহাতেই পৃথিবী চলিতেছে !!

দান—কাশীর মহারাজ তত্রত্য ঈশ্বরী স্ত্রী-হাঁসপাতালে মাসিক ৩০০, টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সুদীর্ঘ কাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন, তাঁহার স্থানে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, নিযুক্ত হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপ প্রশংসিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন, কলিকাতা গেজেটে ছোটলাট তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্তে মারীভয়—কলিকাতা ও উপনগরের স্থানে স্থানে এবৎসর বসন্তের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অনেক দিন এরূপ দেখা যায় নাই। প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় এই রোগে গড়ে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হইতেছে। যাহারা টীকা না লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পীড়া ও মৃত্যু অধিক। টীকা লইতে কেহ যেন ঔদাস্য না করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবৎসর

[illegible] গত বৎসর, ৫৩৮০; এফ,এ ৩০৪১ গত বৎসর ২৩৬০; বি, এ, ১৪২৭, গত বৎসর ১৪২৯ জন। বি এ ভিন্ন অন্যান্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

বিবী আনি বেসাণ্ট—পুনরায় কলিকাতায় আগত। এই মার্চ্চ মাসের প্রথমে নানাস্থানে তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব—বড় বড় জ্যোতির্বিদ-পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ছায়াপথে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে সৌরজগৎ আছে, তাহার জ্যোতি পৃথিবীতে আসিতে ৯ কোটী বৎসর লাগিবে। আলোক প্রত্যেক সেকেণ্ড ১ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইল চলিয়া থাকে।

লেডী এলগিনের সৌজন্য—রাজপ্রতিনিধিপত্নী গরিবদিগের ছোট ভগিনীগণের আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছেন।

শোভাবাজার দাতব্য সভা—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৺ মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে ইহার বার্ষিক সভা মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। ছোট লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসর এই সভার আয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে এবং অনাথ নিরাশ্রয় বিধবাদিগের ভরণপোষণ ও গরিব ছাত্রদিগের সাহায্যে অধিকাংশ ব্যয় হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি কামনা করি।

কার্য্য ধুরন্ধর রমণী—বিলাতের "ওম্যান" নামক সম্বাদ পত্র ১৮৯৪ সালে স্ত্রীজাতির উপকারার্থ যত স্ত্রীলোক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিবি আর্ম্মিষ্টেন ডেণ্টকে ১ম, লেডী হেনরী সমারসেটকে ২য়, সদারলণ্ডের ডচেসকে ৩য়, ইংলণ্ডীয় যুবরাজপত্নীকে ৪র্থ, ওয়ারউইকের কাউণ্টেসকে ৫ম, এবং লেডী জোনকে ৬ষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। নামজাদা না হইয়াও গোপনে যে সকল মহিলা স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতেছেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর তাঁহাদের পুরস্কারদাতা।

গৃহকর্ম্মনিপুণা রমণী—ডেন্মার্কের রাণী স্বহস্তে স্বামীর ছেঁড়া পোষাক মেরামত করিয়া থাকেন।

উঃ পঃ স্ত্রীশিক্ষা সভা—গত ১১ই ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌর প্রাসাদে নূতন স্থাপিত এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে তত্রত্য ছোটলাট সভাপতির আসন লন। বেথুন স্কুলের মত একটী স্ত্রী বিদ্যালয় লক্ষ্ণৌয়ে শীঘ্র স্থাপিত হইবে আশা করা যায়।

বড়লাটের সিমলা যাত্রা—বড়লাট আগামী ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গয়া, দার্জিলিং, দানাপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া সিমলায় যাইবেন।

লেডী ইলিয়ট স্মরণার্থ ফণ্ড—অল্পদিন পরে ছোটলাট সস্ত্রীক এদেশ

ত্যাগ করিবেন। তাঁহার পত্নীর তৈল-চিত্রের জন্য ৬০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আরও ৪০০০৲ টাকা চাই। এ টাকায় বঙ্গমহিলাদের হিতার্থে কোনও অনুষ্ঠান করিলে অর্থের অধিক সার্থকতা হইত।

রাজসৌজন্য—জর্ম্মণির ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী আপনার ভৃত্যদিগকে দিবসের অধিকাংশকাল আলস্যে কাটাইতে দেখিয়া তাহাদের জন্য এক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তকগুলি তাঁহার নিজের নির্ব্বাচিত।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬১ সংখ্যা ৩০৩ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গদেশে নববধূদিগকে শ্বশুরগৃহে বিশেষ সংযত ও সহিষ্ণু হইয়া বাস করিতে হইত। তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদিগের পাদবন্দনা ও চরণামৃত পান করিতেন। গুরুজনদিগের সহিত কোনও অবিনীত ব্যবহার করা তখন গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণনীয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও তখন মাতা পিতার কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না—সে রকম করা মহাপাপ মনে করিতেন। পাছে বালিকা বধূদিগের বিনয়ের কোনও রূপ ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগের লজ্জাশীলতা আতিশয্য দোষে দূষিত হইত। নববধূগণ প্রাণান্তে গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা রোগকাতরতা নির্লজ্জতার স্বরূপ গণ্য হইত।

তখনকার প্রত্যেক গৃহেই প্রায় একান্নভুক্ত বহুপরিবার থাকিত। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য-শূন্য, অসংযত-চিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বহুলোক একত্র বাস করিলে সে স্থান যেমন অশান্তিকর হয়, তখনকার অনেক গৃহ সেই রকম অশান্তিকর হইত *। খুঁটনাটি, চুণটুকু উপলক্ষ করিয়া গার্হস্থ্য বিবাদ, প্রায় সকল ঘরেই ছিল। নববধূগণ, অনেক স্থলেই দারুণ নিপীড়িতা হইতেন। শ্বাশুড়ী, ননন্দিনী, যাতা—প্রধানতঃ সপত্নী (সপত্নী তখন প্রায়ই থাকিত!) নববধূদিগের নিপীড়নের প্রধান কারণস্বরূপা ছিলেন। অভিভাবিকা রমণীগণ যে রকম চাহেন, নববধূ সেই রকম নিরীহ, সেই রকম মৃদুস্বভাবা, সেই রকম গৃহকার্য্যে সুদক্ষা এবং সেই রকম সেবা-পরায়ণা না হইলেই

* একান্নভুক্ত বহু পরিবারের ফলে অনেক মহত্ত্ব, অনেক সুখ, অনেক সাধুতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু "বহু পরিবার" সুশিক্ষিত না হইলে যে তাহার ফল বিষম অনর্থকর হইয়া থাকে, একথা অনেকেই "সত্য" বলিয়া স্বীকার করিবেন।

অনেকে তেলেবেগুণে জলিয়া উঠিতেন। কার্য্যতঃ কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অনেক বালিকাবধূর পক্ষে এ রকম ক্লেশ "অসহনীয়" বলিয়াই বোধ হইত। মাতা পিতার স্নেহ যত্নে লালিতা পালিতা বালিকাটীর পক্ষে এরূপ বধূত্বের ক্লেশ যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি বুঝিতে পারেন। সেই নববধূদিগের অনেকে শ্বশুরালয়কে "যমালয়" বলিয়া মনে করিতেন।

ভার্য্যাগণের অবস্থা যেরূপ জানা যায়, তাহাতে অনুভূত হয় যে পতিপ্রেম অপেক্ষা পতিভক্তিই তাঁহাদের মধ্যে "প্রচলিত" ছিল। তাঁহারা স্বামীকে "অভিন্নহৃদয় বন্ধু" মনে না করিয়া কেবল "পূজনীয় গুরু"ই মনে করিতেন। সেইজন্য সর্ব্বদা স্বামীর পাদবন্দনা, চরণামৃতপান এই সকল ভক্তিভাবপূর্ণ কার্য্যেই তাঁহাদের পরিতৃপ্তি জন্মিত। স্বামীর সহিত একহৃদয় হওয়া, তাঁহার নিকটে অসঙ্কোচে মনের কথা বলা, তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করা এ সকল, তখনকার সময়ে নির্লজ্জতার ও প্রগল্‌ভতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীনা গৃহিণীগণও স্বামীকে দেখিলে একহাত ঘোমটা টানিয়া দূরে পলায়ন করিতেন।

দাম্পত্য প্রেমের যাহা শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ, সেই একনিষ্ঠা পুরুষজাতির মধ্যে কচিৎ মিলিত। পুরুষেরা একবিন্দু ছল ছুতা পাইলেই দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেন। প্রথমা স্ত্রী কেবল কন্যাপ্রসবিনী, কোনও কুমারীর পিত্রাদি কর্ত্তৃক বিবাহ অনুরুদ্ধ, সুন্দরী বা উচ্চ বংশীয়া কন্যা "পুত্র বধূ হইবে" এই লোভে মাতা পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট, প্রথমা ভার্য্যার সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে "জব্দ" করিবার প্রয়োজন এই সকল ঘটনার কোনও একটী উপস্থিত হইলে অনেক পুরুষ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণ বিশেষ কারণ না থাকিলেও বহুতর কুমারীর পাণিপীড়ন করিতেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ভার্য্যার ভরণ পোষণ করা দূরে থাকুক, অনেক ভার্য্যার সহিত বিবাহের সময় ব্যতীত সাক্ষাৎ হইত না। ইঁহারা বিবাহে অনেক টাকা পাইতেন বলিয়া বিবাহ করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। *

এইখানে একটী কথার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেকালে অনেক পুরুষই বহুবিবাহ করিতেন; তাই স্বামীর গভীর প্রণয়তৃষ্ণা রমণী-হৃদয়ে অপরিতৃপ্তাবস্থাতেই থাকিত। এই জন্য, সপত্নীবতী রমণীগণ অনেক সময়ে ঔষধ বা মন্ত্রপ্রয়োগে স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে নিজের বশীভূত ও পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্য হইতে তখনকার মহিলাগণের জীবন যে

* কৌলীন্য প্রথা এদেশ হইতে অদ্যাপি দূর হয় নাই, ইহা নব্য ভারতের কলঙ্কের কথা। তবে অনেকটা হ্রাস হইয়াছে বটে।

কতদূর অসুখী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রমণীগণ গৃহধর্ম্মে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাদিগের গৃহকর্ম্মদক্ষতা ও শ্রমশীলতা যেরূপ প্রশংসনীয়, তাঁহাদিগের দয়া ও সেবাপরায়ণতাও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আত্মীয়দিগের তো কথাই নাই, আতুর, অনাথ, দরিদ্র, বিপন্ন ব্যক্তিগণ নিতান্ত "পর" হইলেও মাতার মত স্নেহে, ভগিনীর মত যত্নে, দাসীর মত পরিচর্য্যায় তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তখন অতিথিসৎকার গৃহস্থগণের পরম ব্রত স্বরূপ ছিল; প্রতিদিন ঘরে ঘরে অতিথি সেবা হইত। গৃহিণীগণ অতিথিসেবার অনুরোধে মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া সন্তুষ্ট মনে উপবাস করিতেন। অপরিচিত বিপন্ন মানব প্রবাসে এইরূপ মাতা, ভগিনী ও পরিচারিকা লাভ করিত।

কেবল মনুষ্য-সেবা নহে, তাঁহাদের দয়া সকল জীবে পরিব্যাপ্ত হইত, তাঁহাদের সেবায় ইতর জীবগণও পরম সুখে থাকিত। গৃহপালিত গরু, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি তাঁহাদিগের নিকটে অপত্যবৎ স্নেহে পালিত হইত। ইহার মধ্যে গো-সেবা একটী প্রধান ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গো জাতি আমাদের যেরূপ উপকারী, তাহারই উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা লাভ করিত। এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতি বা প্রতিবেশী পরিবারের কোনও অভাব বা প্রয়োজন জানিলে তাঁহারা প্রাণপণে সহায়তা করিতেন।

মাতৃগণ শিশুর (শরীর) পালনে নিপুণা ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষানুসারে না হউক, তাঁহারা শিশু-চিকিৎসায়-শিশু-শুশ্রূষায় বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। তবে অনভিজ্ঞতাবশতঃ মানসিক শিক্ষা দিতে পারিতেন না। "জুজু" "কানকাটা" ডাকিয়া, ভূত পেত্নীর কথা বলিয়া, প্রাণের সন্তানকে অনেক সময়ে ভীরু ও নিস্তেজ করিয়া বসিতেন। সূতিকা গৃহের প্রণালী তখন অতিশয় জঘন্য ছিল।

রোগীর শুশ্রূষায় গৃহিণীগণ এত নিপুণা ছিলেন যে চিকিৎসক যে রোগীকে ঔষধে আরাম করিতে পারেন নাই, প্রবীণা গৃহিণীগণ কত সময়ে শুশ্রূষাগুণে সে রোগীকেও আরাম করিয়াছেন। ফলতঃ গৃহধর্ম্ম রক্ষা যেমন তাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারা প্রায় তাহাতেই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত মহিলার পারিবারিক অবস্থা এইরূপই।

সামাজিক অবস্থা। পুরুষ জাতি যেরূপ সমাজের বহির্ভাগ, স্ত্রীজাতি সেইরূপ অন্তর্ভাগরূপে অবস্থিত। সমাজের বাহিরের কাজ যে রকম পুরুষের কর্ত্তব্য, ভিতরের কাজ সেইরূপ রমণীর কর্ত্তব্য। পুরুষ যেমন সমাজের পালক, রমণী সেইরূপ সমাজের সেবিকা। কিন্তু ভারতে অদ্যাপি এমন লোক সকল আছেন, যে রমণীর সামাজিক কিছু কর্ত্তব্য আছে

বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ এমার্সন বলিয়াছেন, পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু রমণী কার্য্যকরী কবি। স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্ এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকে।" হইতে পারে, মহাত্মা এমার্সন স্ত্রীজাতির প্রতি অনুগ্রহাতিশয়ে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সাধ্বী সুশিক্ষিতা রমণী যে জনসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়, ভাবিয়া দেখিলে একথা অনেকেই সত্য বলিয়া বুঝিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, যে দিন সকল রমণী প্রকৃত সুশিক্ষিতা ও সাধ্বী হইবেন, যে দিন সকল রমণীকেই পুরুষজাতি পবিত্রতার প্রতিরূপ বলিয়া বুঝিবেন, সেদিন এজগতে পাপ নীচতা কিছুই রহিবে না। যাহাদিগের জাতীয় উন্নতির উপরে জগতের এতদূর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের "সামাজিক কর্ত্তব্য কিছুই নাই" একথা বলা প্রলাপ মাত্র।

রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য আছে।—রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য রাজকীয় কর্ত্তব্য নহে, রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য পুরুষের নেতৃত্ব গ্রহণ নহে, রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য যুদ্ধবিগ্রহ নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অবস্থা ও ঘটনাক্রমে সঙ্গত হইলেও সাধারণতঃ কোনওরূপ অস্বাভাবিক পুরুষোচিত কার্য্য রমণীর কর্ত্তব্য নহে। রমণী-জীবনে যে সকল সামাজিক কর্ত্তব্য আছে, রমণীর তাহাই পালনীয়।

ধর্ম্মভাব-উদ্দীপন, সাধুতা ও পবিত্রতা বিকাশ, দয়াবৃত্তির চরিতার্থতা, জাতীয় অভাব (স্ত্রীজাতির) মোচন, জাতীয় (স্ত্রীজাতির) উন্নতিসাধন, এবং স্বদেশপ্রীতি অনুশীলন, এই কয়টী কার্য্যকে রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যায়। এই কয়টী করিতেই রমণী পুরুষের সহকারিণী হইবেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল কার্য্য করিবার উপযুক্ত গঠিত জীবন আবশ্যক। রমণীগণের এইরূপ সামাজিক কর্ত্তব্য পালনোপযোগী গঠিত জীবন হইলে, রমণী তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, মানব সমাজ বহুতর উন্নতি লাভ করে—সুপ্রসিদ্ধ এমার্সনের মহাবাক্য সম্পূর্ণরূপে সফল হয়।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে স্ত্রীজাতির অবস্থা ভারতবর্ষে যেরূপ জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে অনেকেই অনুপযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রাণা রমণী বিদ্যাসাগর-জননী, কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী প্রভৃতি দুইচারি জন মহিলা সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ মহিলাগণদ্বারা সামাজিক কর্ত্তব্য অনেকগুলিই পালিত হইত না। তবে সমাজে তাঁহারা যে দুইটি মহৎ কার্য্য করিতেন, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। ধনবতী রমণীগণ দেবতা-প্রতিষ্ঠা, ব্রতাচরণ, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কার্য্য করিতেন, ইহাতে

সাধারণের মনও ধর্ম্মপথে আকর্ষিত হইত। ক্ষুধার দীনে দান, ব্যথিতে দয়া, অন্নসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের দ্বারা দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, ইহাতেও জনসমাজ মহোপকৃত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য করিবার মত তাঁহাদিগের শিক্ষা, অবস্থা ও ক্ষমতা কিছুই ছিল না।

সমাজে স্ত্রীজাতির জাতীয় সম্মান ও গৌরব যে রকম ছিল, তাহা মনে করিতে গেলে আগে আর্য্য ভারতের কথা মনে পড়ে। সেই একদিন, এই ভারতবক্ষে দাঁড়াইয়া, প্রাণের উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ভরিয়া আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"‡

বর্ত্তমান সভ্য সমাজে (বিদেশের অবশ্য) স্ত্রীজাতি বিশেষ সম্মানিতা ও গৌরবান্বিতা বটে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে যে রকম সম্মান গৌরবের চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বুঝি কোনও দেশে—কোনও সমাজে নাই।

ভারতীয় আর্য্যগণের রাজত্বের সহিত ভারত মহিলার সে সামাজিক সম্মান গৌরব দূর হইয়াছিল, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ তাহা জানিতেছেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগে (ব্যক্তি বিশেষ না হউক) সাধারণ রমণীগণ এদেশে পুরুষ সমাজে অশ্রদ্ধেয়া ও অবহেলনীয়া ছিলেন। পুরুষের মধ্যে যাহারা স্বার্থপর, তাঁহারা স্ত্রীজাতির উপরে নানারূপ নির্ম্মম প্রভুত্ব খাটাইতেন। স্বার্থপর পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ "ধর্ম্মাচরণ" বলিয়া স্ত্রীজাতির নিকট হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিত; বিধবা রমণীর সম্পত্তি স্বার্থপর আত্মীয় বা কুটুম্বগণ ফাঁকি দিয়া অথবা কাড়িয়া লইত। স্ত্রীজাতির ভ্রম, ত্রুটি, দোষ প্রভৃতি দেখিলে সংশোধন করা দূরে থাকুক, "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া সাধারণ লোকে হাসিত। মার্জ্জিত জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা অভাবে স্ত্রীজাতি নিজেদের দুরবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিতেন না—অথবা জাতীয় উন্নতির জন্যও কোন চেষ্টা করিতে পারিতেন না, "অদৃষ্ট লিপি" অথবা জন্মান্তরের কর্ম্মফল বলিয়াই সকল দুঃখ সহিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রমণীদিগের অনেকেই শৈশবে বিবাহিতা হইত। শৈশবেই কোন কোন কুমারীকে দশ গণ্ডা সপত্নীর উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইত। কোথাও পাঁচ বৎসরের বালিকাকে পঞ্চাশবর্ষবয়স্ক পুরুষের সহধর্ম্মিণীত্ব করিতে দেওয়া হইত। বালিকা বিধবা অথবা শিশু বিধবা অপরিচিত, অজ্ঞানিত পতির জন্য চিরদিনই ব্রহ্মচর্য্য করিত। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী করিয়া গঠন করা হইত না, যে সকল মানসিক শক্তির অনুশীলনে মানব আত্ম-জয়ের শিক্ষা লাভ করে, তাহাদিগের সে মান-

‡ যেখানে স্ত্রীলোকেরা পুজিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন; আর যেখানে স্ত্রীলোকেরা অনাদৃতা হন, সেখানে সকল ক্রিয়াই বিফল।

সিক শক্তির অনুশীলন হইত না; তথাপি সমাজ তাঁহাদিগকে "পতিপ্রাণা ব্রহ্মচারিণী" সাজাইতে চাহিত। প্রাপ্ত-বয়স্কা নববিধবাগণ কেহ কেহ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। "সহমরণে" বংশগৌরব ছিল বলিয়া অনেকে সহমরণের জন্য স্ত্রীজাতিকে উত্তেজিত করিত। যে নববিধবা অগ্রে স্বীকৃতা হইয়া, পরে সহমরণের ক্লেশ স্বীকার করিতে অসম্মতা হইত, সমাজ তাহাকে কখনই ছাড়িত না, তাহাকে বাঁশবাখারির লাঠির আঘাতে আধমরা করিয়া সহমৃতা করাইত। সেইরূপ রমণীরও বহুবৎসর স্বর্গ লাভ হইত!

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত-মহিলাদিগকে, সমাজ এই রকম নিষ্ঠুর অধীনতায় বাঁধিয়া পদদলিত করিতেন। স্ত্রীজাতির বাহিক স্বাধীনতা আমরা "বঙ্গদেশের উপযোগী" অদ্যাপি বলিতে পারি না।* কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনতা, জাতীয় জীবনের উন্নতি বিষয়ে স্বাধীন-চিন্ততা, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতি, শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত মহিলাদিগের সাধারণতঃ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পঞ্জাব, বোম্বাই, লাহোর, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে স্ত্রীজাতির বাহিক স্বাধীনতা অনেকটা প্রচলিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারাও বঙ্গমহিলার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরাধীনা ছিলেন। শৈশব বিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা তাঁহাদের সমাজেও প্রচলিত ছিল। লেখা পড়া অথবা জ্ঞানানুশীলন ভারতের কোনও স্থানেই প্রচলিত ছিল না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে আর্য্যগণ "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" বলিয়াছিলেন, গত শতাব্দীর সেই ভারতবর্ষে, নারী জাতির অবস্থা মোটের উপরে এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

লণ্ডনে নগরে ও প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ব্রিমেন নগরে দিবাভাগ ১৬ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টকহলম নগরে দিবাভাগ ১৮ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্স্বর্গ নগরে ও সাইবিরিয়া প্রদেশের অন্তঃপাতী টোবলস্ক নগরে দিবাভাগ ১৯ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ফিন্‌লেণ্ড প্রদেশের টর্ণিয়া নগরে জুন মাসের ২১ তারিখে ২২ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। উত্তর কেন্দ্রস্থ স্পিটজ বার্জেন নগরে দীর্ঘতম দিনের স্থায়িত্ব সার্দ্ধ তিন মাস কাল।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময়ে

* স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদিগের যে মতামত তাহা ১২৯৮ সালের পৌষ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় 'ভিখারিণীর গীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছি।

এবং কোন্ ব্যক্তি চসমা প্রস্তুত করেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইয়োরোপে উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর্‌লাটি নামক ফ্লোরেন্সবাসী একজন ইতালীয় কর্ত্তৃক প্রথম প্রস্তুত হয়।

ইংলণ্ডের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগের সংস্কার আছে যে জানুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কন্যা সৎস্বভাবা ও বুদ্ধিমতী গৃহিণী হইবে; ফেব্রুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে দয়াবতী, স্নেহ-ময়ী ও স্বামিভক্তিপরায়ণা হইবে; মার্চ্চ মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কলহপ্রিয়া ও আমোদপ্রিয়া হইবে; এপ্রেল মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধিহীনা কিন্তু শ্রীসম্পন্না হইবে; মে মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে সুখ-সম্পদভোগিনী, সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী হইবে; জুন মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে আবেগ পূর্ণা হইবে এবং অল্প বয়সে পরিণীতা হইবে; জুলাই মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে অসন্তোষপ্রকৃতি হইবে; আগষ্ট মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কার্য্যনিপুণা ও অমা-য়িকস্বভাবা হইবে এবং ধনী ব্যক্তির সহিত পরিণীতা হইবে; সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে বিবেকসম্পন্না ও মিষ্ট ভাষিণী ও সর্ব্বজন প্রিয়া হইবে, অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে রূপলাবণ্য-বিশিষ্টা কিন্তু অসুখিনী হইবে, নবেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে স্থূলকায়া ও অপরিমিতব্যয়শীলা হইবে।

সাক্ষাৎ হইলে ইংরাজে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কেমন আছ?" ফরাসীরা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আপনাকে কেমন ভোলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ?" ইটা-লীয় জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার অবস্থা কিরূপ?" জর্ম্মণ বলেন "তুমি আপ-নাকে কেমন দেখ্‌ছ?" সুইডেনবাসী বলেন "তুমি কেমন?" ওলন্দাজ বলেন, "তুমি কিরূপ বলেছ? "মিসরবাসী বলেন;—"তোমার কেমন ঘর্ম্ম হচ্ছে?" চীন জিজ্ঞাসা করেন "তোমার উদরের অবস্থা কিরূপ?" অথবা "তুমি কি ভাত খেয়েছ?" পোলাণ্ডবাসী জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আপনাকে কেমন রেখেছ?" রুষ বলেন, তুমি কেমন বেঁচে আছ?" পারস্যবাসী বলেন "তোমার ছায়া যেন কখন হ্রস্ব না হয়।" পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই সমস্ত সম্ভাষণ গুলির একই ভাবার্থ।

মৎস্যের শ্রবণ শক্তি আছে ইহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। মৎস্যজীবী-দিগের এই তত্ত্ব প্রায় জানা নাই। তাহারা মৎস্য ধরিবার সময় মৎস্য শ্রবণ-শক্তি-বিহীন মনে করিয়া শব্দ করা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করে না। মৎস্যের শ্রবণশক্তির প্রামা-ণিকতা সম্বন্ধে কোন ইংরাজ প্রাণিতত্ত্ব বিদ বলেন যে একবার তিনি একটী পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাই-লেন। একদল শিকারী পক্ষী মারিবার জন্য বাহির হইয়াছিল; ক্রমাগত বন্দুক ছুড়িতেছিল। তিনি দেখিলেন যতবার

বন্দুকের শব্দ হইল, তত্তবার তাঁহার সম্মুখস্থ ঘাটের জলে যে সকল মৎস্য ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা ভীত হইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী মিসিসিপি নদীর তীরে "রাক্ষস পাদপ" নামে এক জাতীয় বিষাক্ত বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই বৃক্ষের নিকটস্থ স্থানে অন্যান্য লতা বৃক্ষাদি রোপিত হইলে তাহা অল্পকাল মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার লালবর্ণ ছোট ছোট ফুল হইয়া থাকে। ফুলগুলি দেখিতে পেয়ালার ন্যায়; মধ্যভাগে অতি অল্প পরিমাণ জলীয় পদার্থ দেখা যায়; উহা কীট পতঙ্গদিগের প্রাণনাশক। পুষ্পমধ্যস্থ এই জলীয় পদার্থে শত শত মক্ষিকা ও অন্যান্য পতঙ্গ মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখা গিয়া থাকে। গরু বাছুর এই বৃক্ষের পত্র বা পুষ্প আহার করিলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই বৃক্ষের বিষের প্রতিশোধক এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমেরিকার যে সকল স্থানে "রাক্ষস পাদপ" জন্মাইতে দেখা যায়, সেই খানেই প্রায়ই ভয় হইয়া থাকে।

বারমেসে।

চৈত্র।

জল হইয়া "যো" হইলেই এইমাসে অধিক পরিমাণে ভূমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। বৈশাখ মাসে যে সকল ফসলের আবাদ করিতে হয়, জলের সুবিধা হইলে, তৎসমুদয় এই মাসে করা যাইতে পারে। জল না হইলেও কৃষকেরা এই মাসে আশুধান্যের "কাঁকড়ি" করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে শুষ্ক ভূমিতে অধিক পরিমাণে লাঙ্গল ও মই দিয়া মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। সেই ধূলির মধ্যে আশুধান্যের বীজ বপন করিতে হয়। পরে জল হইলে অবিলম্বে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঐরূপ শুষ্ক ভূমির ধূলির উপর বীজ বপন করাকে 'কাঁকড়ি' করা বলে। 'কাঁকড়ির' অনেকবীজ পক্ষ্যাদিতে নষ্ট করিয়া ফেলে বটে, কিন্তু ঐ প্রক্রিয়ার আর একটা বিশেষ গুণ আছে। ঐরূপে উক্ত বীজ হইতে যে সকল ধানের গাছ জন্মে, তাহাতে আদৌ কোন প্রকার পোকা লাগে না। ইহা ধান্য আবাদের পক্ষে নিতান্ত অল্প সুবিধা নহে। কেননা আশুধান্যে বিবিধ কীটের উৎপাত হইয়া থাকে।

বেগুনের চারা—এই মাসে বেগুণের চারা তৈয়ার করিতে হয়। একটী চৌকার মাটী উত্তমরূপে চূর্ণ ও সার মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বেগুনের বীজ বপন করিবে এবং চৌকার মাটী চাপিয়া দিবে, নচেৎ পিপীলিকা ও অন্যান্য কীটে তাহা খাইয়া ফেলে। খেজুরের

পাতা কলার বাইল দ্বারা ঐ চোকা আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার উপর অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করিবে। এই চারা বড় হইলে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইটী মাস বাদ দিয়া অবশিষ্ট দশ মাসের যে কোন মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে রোপণ করাই প্রশস্ত। বেগুণের ক্ষেত্র শুষ্ক হইলেই তাহাতে জল দিতে এবং গাছে বা ফল-ফুলে পোকা ধরিলে তাহাতে ভস্মচূর্ণ দিতে পারিলে বার মাসই বেগুণ ফলে। কিন্তু শীতকাল ভিন্ন অন্যকালে জাত বেগুণ তাদৃশ সুস্বাদু হয় না। এই ফসলের চাষ আবাদ সম্বন্ধে খনা আপন স্বামী মিহিরকে 'বরাহের পো' এই নাম দিয়া বলিয়াছেন,—

"বলে গেছে বরাহের পো।
দশটী মাস বেগুণ রো ॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।
ইথে নাই কোন বিবাদ ॥
পোকা ধরলে দিবে ছাই।
এর চেয়ে ভাল উপায় নাই ॥
মাটী শুকালে দিবে জল।
সকল মাসে পাবে ফল ॥"

ইক্ষু,—ফাল্গুন মাসে ইক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়। কোন কোন কৃষক প্রত্যেক ঝাড়ের কিয়দংশ ভূমিতে রাখিয়া ইক্ষু ছেদন করে। চৈত্র মাসে সেই ভূমিতে সাবধানে ২।১ বার লাঙ্গল দিয়া তাহাতে জলসেচন করে। তাহাতে প্রত্যেক ইক্ষুমূলের চতুঃপার্শ্ব হইতে নূতন ইক্ষু জন্মে। সেই ইক্ষুকে রীতিমত পালন করিলে তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হয়। এইরূপে একবার আবাদ করিয়া ২।৩ বর্ষ ইক্ষু আবাদ চালাইতে পারা যায়।

পান,—এই মাসে পানের লতা অনেকটা বড় বড় হয়। তাহার কিয়-দংশে টানিয়া খড়ি খাঁকড়ার গোড়ায় জড়াইয়া দিয়া অগ্রভাগ মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। পানের পাতা প্রস্তুত অর্থাৎ পক্ক হইলে প্রথমে লতার মূলের দিক্ হইতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে।

আর একজাতীয় পান ও লঙ্কা আছে, উভয়ই লতা জাতীয়, যে কোন বৃহৎ বৃক্ষের মূলে উহা রোপণ করিয়া ঐ বৃক্ষে উঠাইয়া দিতে হয়। উহার বিশেষ চাষ আবাদ কিছু নাই। লঙ্কার নাম "চই," উহার গোড়াই লঙ্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ লঙ্কা হইতে উহা স্নিগ্ধ ও উপকারক। যে সকল পীড়ায় লঙ্কা মরিচের ঝাল এককালে নিষিদ্ধ, তাহাতে 'চই ঝাল' অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। ঐ পানের বিশেষ কোন নাম নাই। উভ-য়ই বঙ্গের পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

কুলের কলম,—যদি কুলের "চোঙ্গ কলম" ও "চক্ষু কলম" করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা এই মাসেই করিতে হইবে। কলম করা উদ্যান কার্য্যের অন্তর্গত। উহা নানাবিধ এবং বিলক্ষণ জটিল

ব্যাপার। একবার স্বচক্ষে ঐ সকল প্রক্রিয়া দর্শন না করিলে, কেবল বিবরণ পাঠে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।

(১) একটী দেশী কুলের নধর চারার মূল হইতে এক ফুট আন্দাজ রাখিয়া ছেদন করিবে। ঐ ছিন্ন অংশের অব্যবহিত নিম্নে যে পত্রগ্রন্থি আছে, তাহা হইতে ছিন্ন অংশ পর্য্যন্ত চারিপাশের ছাল চাঁচিয়া ফেলিবে। একটী বিলাতী কুলের নূতন তেজাল শাখার কর্ত্তিত মুখের দিকে কিঞ্চিৎ মাইজ বা কাষ্ঠ বাহির করিয়া ফেলিবে। চতুর্দ্দিকের ত্বক্‌টী যেন ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া না যায়। এই শাখার কাষ্ঠশূন্য অংশ পূর্ব্বোক্ত চারার কাষ্ঠে বসাইয়া দিবে। এই কার্য্য এরূপ হস্তনৈপুণ্য ও বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে যেন, ঐ যোড়ের কাষ্ঠ ও ত্বক্‌ ছোট বড় এবং শিথিল না হয়। পরে উহার চারিদিকে মসলা মাটী দিয়া চট বা মোটা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই কলমে অধিক রৌদ্র না লাগে এবং যে পর্য্যন্ত বর্ষারম্ভ না হয়, তদবধি জলের ঝারা দিতে হয়। এই প্রস্তুতীকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই কলম শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার নাম "চোঙ্গকলম"।

(২) দেশী কুলগাছের যে সকল স্থান হইতে শাখা নির্গত হয়, সেই সকল স্থানকে চক্ষু কহে। এই মাসে গাছে নূতন শাখার মুকুল বা কুঁড়ি নির্গত হইতে থাকে। উত্তম ধারাল ছুরী দ্বারা চক্ষুঃপার্শ্বের কিঞ্চিৎ ত্বক ও কাষ্ঠের সহিত ঐ কুঁড়ি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর বিলাতী কুলের তাদৃশ নূতন শাখা মুকুল বা কুঁড়ি আনিয়া উহার মধ্যে বসাইয়া দিতে হইবে। পরে তাহাকে যথাবিধি পালন (যেমন চোঙ্গকলমে বিবৃত হইয়াছে।) করিলে চক্ষু কলম প্রস্তুত হয়।

বাঁশ,—গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে গোবর ও জল দিয়া উত্তমরূপে কাদা করিবে। একখানা পুরাতন বাঁশের কিয়দংশ মূল শুদ্ধ তুলিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দিবে। ঈষৎ হেলাইয়া বসাইবে এবং চারি পাঁচ হাতের অধিক রাখিবে না। উহাকে বাঁশের মুড়া কহে। মধ্যে মধ্যে উহার মূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়। ইহা হইতে কাল সহকারে একঝাড় নূতন বাঁশ প্রস্তুত হয়।

আরও এক প্রকারে নূতন বাঁশঝাড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক খানা বহুগ্রন্থিযুক্ত পাকা বাঁশ লম্বাভাবে পুতিয়া ফেলিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে তদুপরি জল দিতে হয়। ক্রমে উহার প্রত্যেক গাঁইট হইতেই প্রায় নূতন বাঁশ জন্মে। প্রথম দুই তিন বৎসর বাঁশ সকল বড় স্থূল হয় না। পরে যথাকালে অনুরূপ অন্তরে কয়েকটা ঝাড় রাখিয়া অবশিষ্ট ঝাড়গুলি মারিয়া ফেলিলে বাঁশ ক্রমশঃ মোটা ও লম্বা হইতে থাকে। এই সকল ব্যাপার কেবল পড়িলে চলিবে না।

যাঁহার সুবিধা আছে, তাঁহাকে হাতে কলমে করিতে হইবে, যে হেতু এসকল বিষয় ক্ষণিক আমোদজনক কার্য্যও নহে,—নাটকও নহে। কাজের কথা, কাজে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করাই উচিত। এই মাসে পুরাতন বাঁশঝাড়ের গোড়ায় সরস পলি মাটী তুলিয়া দিতে হয়, যথা—

"ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী।
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটী॥"

তিল,—ফাল্গুন মাসের শেষ আট-দিন এবং চৈত্র মাসের প্রথম আটদিন, এই ষোলদিনের মধ্যে যে কৃষক তিল বপন করিতে পারেন, তাঁহার তিল বেশ হয়। যথা,—

ফাল্গুনের আট চৈতের আট।
সেই তিল দায়ে কাট॥"

এই প্রবাদে গাছ তেজাল হইবার কথা আছে। গাছ তেজাল হইলেই ফলন বেশী হওয়া সম্ভব।

ভুট্টা,—এই ফসলকে এদেশে জনারা কহে। ধান্যাদির চাষ আবাদ যেমন এদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, পশ্চিমে ভুট্টার আবাদ তদ্রূপ। মথুরা, কাণপুর, বুলন্দসহর, ফরেক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে আমরা ভুট্টার ক্ষেত্র ও আড়ত দেখিয়াছি তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ঐ ফসল তত্তদ্দেশের একটী প্রধান শস্য। আড়ত সকলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরে ভুট্টায় ফল বোঝাই হইয়াছে। বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা ঐ ফল হইতে দানা বাহির করিতেছে। বেলেঘাটা প্রভৃতি চাউলের আড়তে যেমন পর্ব্বতময় চাউ-লের কাঁড়ি দৃষ্ট হইয়া থাকে, উপরি উক্ত স্থান সকলে সেইরূপ ভুট্টা দানার স্তুপ দেখা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে ভুট্টা একটী মূল্যবান্ ফসল। সেই জন্য কথিত আছে,—

"যদি থাকে টাকা করিবার গোঁ।
তবে চৈত্রমাসে ভুট্টা গিয়া রো॥"

চৈত্রমাসে ভুট্টার আবাদ করিলে ফসল বেশী হইয়া অর্থাগম হয়।

আমরা এতদিনে "বারমেসে" অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের প্রয়োজনীয় কৃষি বিবরণ শেষ করিলাম। এক্ষণে "কৃষি সম্বন্ধে নানা কথা" এই শিরোনামে কিছু বলিতে উদ্যত হইলাম। তন্মধ্যে চৈত্রমাসের বিবরণের সহিত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাস সংক্রান্ত কথায় আলোচনা করিব।

"যদিবর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজা পুণ্যদেশ।
যদি বর্ষে ফাল্গুনে,
চিনা কাউন দ্বিগুণে॥"

মাঘের শেষে বর্ষণ হইলে নৈদাঘ ও হৈমন্তিক উভয়বিধ ফসলই উত্তম হয়। ফাল্গুন বর্ষণ হইলে পশ্চিম দেশীয় চিনা ও কাউন নামক ধান্য দ্বিগুণ পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

"মাঘ মাসে বর্ষে দেড়া।
রাজা ছেড়ে প্রজায় সেরা॥"

মাঘ মাসে সুবৃষ্টি হইলে কৃষকগণ বহ-

শস্য পাইয়া পরম সুখী হয়। তখন তাহারা অন্যের নিকট রাজবৎ সেবা ও সম্মান প্রাপ্ত হয়।

"যদি হয় চৈত্র মাসে বৃষ্টি।
তবে হয় ধানের সৃষ্টি॥"

যে বৎসর চৈত্র মাসে সুবৃষ্টি হয়, সে বার প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে।

"যদি বর্ষে মকরে।
তবে ধান হবে টিকরে॥"

মাঘ মাসে সুবৃষ্টি হইলে টিকর, অর্থাৎ উচ্চ ভূমিতেও ধান জন্মে।

"চৈতে কুয়া ভাদ্রে বাণ।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ী টান॥"

যে বৎসর চৈত্র মাসে কোয়াসা এবং ভাদ্র মাসে বন্যা হয়, সে বর্ষে নিশ্চয়ই মহামারী হইয়া সেখানে সেখানে নর কপাল গড়াগড়ি যায়।

"চৈত্রে থর থর বৈশাখে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে॥"

যে বৎসর পর্য্যন্ত খুব শীত থাকে বৈশাখ মাসে ঝটিকা সহকারে শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক মেঘ বৃষ্টি হয় না; সে বৎসর নিশ্চয়ই সুবর্ষা হইয়া থাকে।

যদি বাহ্য প্রকৃতির ফলাফল, ঐ সকল প্রবাদ অনুসারে সংঘটিত হয় এবং কৃষকগণ পূর্ব্ব হইতে তাহার অনুশীলন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে কৃষক মাত্রেরই পরীক্ষা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

সিংহলের কতকগুলি আচার ব্যবহার।

ভগিনীগণ! আপনারা জানেন বা নাই জানেন আমরা বলি যে সিংহল প্রাচীন বাঙ্গালাজাতির উপনিবেশ মাত্র। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব, তখন এই উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। তজ্জন্য অনেক সিংহলবাসী এখনও বাঙ্গালীদিগের বংশসম্ভূত ও বাঙ্গালী উপনিবেশীদিগের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়া গৌরবসূচক মনে করেন। করিবারও কথা। কালের স্রোতে অন্যান্য সমস্ত সৌসাদৃশ্য ভাসিয়া গেলেও একটি অবশিষ্ট আছে, তাহা কোনও কালে যাইবার নয়। সেটী দেহের গঠন। আহা! আমরা বাঙ্গালী, আমরা যতদূর অধঃপতিত হইতে হয় হইয়াছি। আমাদিগের আবার উপনিবেশ! আমাদিগের উপনিবেশিকগণ আবার আমাদিগের গুণকীর্ত্তন করেন এবং আমাদিগের আদর্শে চরিত্র ও সমাজ গঠন করিতে যত্ন পান। একথা শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। ইহাতেই বেশ জানা যায় যে বর্ত্তমান সিংহলবাসিগণ

কতদূর বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। বিধাতার নিয়মে যখন কোনও জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তিনি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় তাহাদিগকে আনিয়া উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই বলিয়াই বুঝি আজ সিংহলের কৃতবিদ্য ধনী মানীব্যক্তিগণ সমাজ, নীতি ও আচার ব্যবহার সংস্করণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাদিগের বহুকাল হইতে প্রচলিত পরিচ্ছদ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আরও হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাতে দৃষ্টি পড়িয়াছে, আন্দোলন চলিতেছে।

সংপ্রতি সিংহলের কতকগুলি ভদ্র-মহিলা বুদ্ধ গয়াদিতীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহা-দিগের পরিচ্ছদ অনেকটা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের মত। তবে দেখিলাম সধবাতেও থান পরিয়াছেন আর বিধবা-তেও সধবার মত শাটী—বোম্বাই শাটির মত শাটি পরিধান করিয়া থাকেন। তথ্যানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে উঁহারা যেরূপ পরিহিতা ছিলেন, তাহা উহাদিগের দেশ প্রচলিত প্রথানুমোদিত নহে। তথায় স্বতন্ত্র প্রণালী। সে যাহা হউক আমরা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, উঁহারা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পোষাক অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন। ইহা-দিগের সহিত পার্থক্য এই যে, তাঁহারা পার্শি বা মাদ্রাজের মহিলাদিগের মত কুশা জামা পরিধান করিয়া দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া রাখেন। গৃহপরিচ্ছদ যাহাকে ভাষায় আট পহুরিয়া পোষাক বলে, তাহা সচারাচর আমরা বহির্জগতে থাকিয়া দেখিতে পাই না। ইহা কোনও প্রকার দুই খণ্ড বস্ত্রে সম্পন্ন। একখণ্ড কটি হইতে পাদদেশ, অপর খণ্ড কটি হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি বিধবা কি সধবা জামা সকলেরই গাত্রে। অবগুণ্ঠন প্রথা সিংহলে প্রচলিত না থাকায় সিংহলমহিলাকে অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিতে দেখি নাই। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক-দিগের মত বেশ বিন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু বিধবাকেও আমাদিগের দেশের স্বর্ণ রৌপ্য ফুল সদৃশ স্বর্ণ বা রৌপ্য কেশাল-ঙ্কারে কেশ বিভূষিত করিতে দেখা গিয়াছে। সিংহল নারী চর্ম্ম পাদুকাও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হিন্দু সন্ন্যাসিনী আছেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীও আছেন। ধর্ম্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইলে, ইহঁারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি লাভ করিয়া থাকেন,—যথা উপাসিকা ও ভিক্ষুনী। গৃহস্থের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইল, এক্ষণে বৌদ্ধ-বৈরাগিণী দিগের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। এই সুযোগে লেখক অনেক উপাসিকাকেও দর্শন করেন। ইহঁাদের মধ্যে অনেক-গুলি বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও কতকগুলি যুবতীও ছিলেন। কেহ কেহ বিবাহ করিয়া শেষে স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন

পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা চিরকুমারী আছেন—আদৌ বিবাহ করেন নাই। ইহাঁরা পাদুকা পরিধান করেন না। পরিধেয় সাদাথান বা ধুতি। সকলের গায়ে জামা দেখিলাম। ইহাঁরা ভিক্ষু শ্রমণদিগের ও আমাদিগের দেশের বিধবাদিগের ন্যায় একাহারিণী। বৌদ্ধ বলিলে বাঙ্গালী সাধারণে অহিংসা পরমধর্ম্ম-পরতন্ত্র নিরামিষভোজী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাহা নয়। সন্ন্যাস আশ্রমধারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষভোজী। গৃহীদিগের মধ্যে অনেকেই আমিষভোজী। আমাদিগের দেশে যেরূপ সধবাকে আমিষ ভোজন করিতেই হইবে, সিংহলে সেরূপ নহে। মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করা তথাকার সধবাদিগের স্বেচ্ছাধীন, খাইলেও কোন বাধা নাই, না খাইলেও দোষ নাই। কপালে সিঁদুর, হাতে "লো" যেমন আমাদিগের সধবার চিহ্ন, সিংহলবাসিনীর সেরূপ কিছুই নাই। ইহাঁদিগের অনুষ্ঠীত ব্রতাদির কথাও বিশেষ কিছু শুনা যায় না, তবে এইমাত্র শুনিয়াছি যে, শুক্ল পক্ষীয় পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকেন।

পাত্রের বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৮।২০ ও পাত্রীর বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৬।১৮ বৎসর হইলে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বৌদ্ধ বিবাহ হিন্দু বিবাহের মত নহে। ইহাতে পুরোহিতও নাই, মন্ত্রও নাই, বিগ্রহও নাই। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষীয় মাঙ্গল্য ও বস্ত্র অলঙ্কারাদি লইয়া বিবাহ দেন। বলিতে কি ইহা কতকটা (সিভিল ম্যারেজের) আইনের বিবাহের মত। সিংহলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারেন, নাও পারেন। কোনও রূপ সামাজিক বাধা নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না এক্ষণে, কিছু কিছু, দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বালিকা, বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলম্বো নগরীর সঙ্ঘমিত্রা বালিকা বিদ্যালয় প্রধান। প্রধান প্রধান বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী অধ্যাপনাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মনে করুন্ কাহারও নাম নবীনচন্দ্র ঘোষ। সিংহলী প্রথানুসারে ইহা রাখিতে হইলে ঘোষ নবীনচন্দ্র এইরূপ হইবে। আবার দেখুন, প্রায় সমস্ত সিংহল অধিবাসীর অনার্য্য বিজাতীয় খ্রীষ্টীয় নাম। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে খৃষ্টীয় ওলন্দাজদিগের অধীনে বহুকাল থাকাতে সিংহল এতদূর আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় যে, অধিবাসীরা প্রায় সকলে বিজাতীয় খৃষ্টীয় নাম ও ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। এজন্য ইহাদিগের প্রায় সকলেরই ইউরোপীয় নাম। ধর্ম্ম বিধর্ম্ম কিম্বা প্রেতাত্মামূলক বিকৃত বৌদ্ধ

ধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা, কি সিংহলে, কি তিব্বতে, কি শ্যামে, কি ব্রহ্মে, কি চীনে, কি জাপানে, বর্ত্তমান বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও সেই প্রকার বিকৃত শোচনীয় অবস্থা, সুতরাং সিংহলের ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য নাম পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কারের অপনয়ন এবং সমাজ পুনর্গঠন করা।

মুসলমানদিগের মত সিংহলীদিগের শগড়ির বিচার নাই। ইহাঁরা বিছানায় বসিয়া অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে হিন্দুদিগের আচারটা ঐরূপ হইলেও তাঁহারা শয্যায় বসিয়া ভোজন পানাদি করেন না।

মৃত্যুর পর হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন চতুর্থী, দশপিণ্ড, ক্ষৌরকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদির বিধি আছে, সিংহলনিবাসী বৌদ্ধদিগের তৎসমতুল্য ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থা আছে। চল্লিশ দিনে অশৌচ শেষ হয়—পরে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য।

(৫৪১ সংখ্যা ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

শাস্ত্রে যে অণ্ড হইতে, মতান্তরে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে, ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা হয়, তাহার অর্থ এই যে অণ্ডাকার ক্ষিতি-মণ্ডল বহুকাল জলে ভাসমান ছিল। তত্ত্ব সকল পরিণত হইয়া আসিতে আসিতে যখন জল হইতে গন্ধ তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া তাহার পরিণামে ক্ষিতিতত্ত্ব উদ্ভূত হইল, তখন ঐ জল রাশিকে ক্ষিতি তত্ত্বের আধার বলা হইল। এজন্য ক্ষিতি-মণ্ডলরূপ অণ্ড জলে ভাসমান ছিল বলা যাইতে পারে। ক্ষিতিমণ্ডলরূপ অণ্ডকেই ব্রহ্মার আবাসস্থান রূপ পদ্ম বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। মতান্তরে উহাকেই মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম বলে, কারণ ক্ষিতিতত্ত্ব প্রাকৃতিক পরিণামের সীমান্ত স্থল। সমস্ত তত্ত্বই মুকুলাবস্থা হইতে এই স্থলে আসিয়া পরিপুষ্টতা লাভ করে। মান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ এই ক্ষিতিতত্ত্বেই হইয়া থাকে; কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় স্থান আকৃতির উদ্ভব এই ক্ষিতিতত্ত্ব হইতেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং, ইহাকে ব্রহ্মার আধার রূপ পদ্ম বা উৎপত্তিস্থানরূপ অণ্ড এই উভয় প্রকারেই কল্পনা করা যাইতে পারে। উক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে, অর্থাৎ ভূখণ্ড জল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রকাশিত হইলে, ব্রহ্মা তদুপরি অধিষ্ঠান করিলেন অর্থাৎ ক্ষিতি তত্ত্বের পরিণামে, যে প্রথম উদ্ভিদরূপ জীবত্বভাব দেখা দিল, তাই ব্রহ্মানামে কল্পিত হইল।

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই কোথা হইতে আসিলাম বলিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করাতে তাঁহার চারিটী মুখ হইল এবং নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে পদ্মনাভের অভ্যন্তরে নিজমূল অন্বেষণার্থে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অন্বেষণে কৃতকার্য্য না হইয়া, পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল কথাদ্বারা এই অনুভব হয়, যে, জলজ বৃক্ষের পত্র পুষ্পসকল কোনও রূপ আবরণাভাবে একই সময়ে চতুর্দ্দিক দর্শন করিতেছিল, এজন্য ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ বলিয়া কল্পিত হইলেন, এবং জলজবৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকা জল ভাগ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উত্থিত হইতে যে কতকাল লাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহার মূল অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইলেন না।

জলজ বৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকারাশি কালক্রমে জলভাগ অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ জলে মৎস্য, কীট ও জল জন্তুসকল উৎপন্ন হইয়াছিল, কারণ চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটনামক দৈত্যদ্বয় উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। কীটভ শব্দের উত্তর স্বার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিলে, কৈটভ পদ-সিদ্ধ হয়। অতএব জলমধ্যে প্রথম কীট সকলের জন্ম হওয়াকে লক্ষ্য করিয়াই কৈটভ নামক অসুরোৎপন্ন হওয়া কল্পিত হইয়াছে। মধু এক প্রকার পতঙ্গ বিশেষ, যাহারা কীটরূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে পাখা নির্গত হইলে মশক ও মক্ষিকা ইত্যাদি হইয়া উড়িয়া যায়। মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুর সহিত বহুকাল (দেবমানে ৫০০০ বৎসর) যুদ্ধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্তি-কালে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমরা যেন পৃথিবীর উপরিভাগে তোমার হস্তে নিহত হই। ইহার অর্থ এই যে কালক্রমে যখন জল ভাগ কমিয়া গেল এবং মৃত্তিকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া দেখা দিল, তখন কীট পতঙ্গাদি জীবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এইক্ষণে দেখ উদ্ভিদ রাজ্যের জীবত্ব ভাবের নাম ব্রহ্মা, এবং উদ্ভিদ সকল সেই জীবনী শক্তির অধীন বলিয়া উহা ব্রহ্মার সৃষ্টবস্তু হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মা যেন প্রথমে উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় সৃষ্টিতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি তির্য্যক্ জীব স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

জাপান।

ওই যে দ্বীপটী লোহিত বরণ
প্রশান্তসাগরে ক্ষুদ্র আয়তন,

দেখ নিরখিয়ে দেখ একবার
তুলনায় চীন-সাম্রাজ্য উহার

কতগুণে বড়!—নগণ্য জাপান
একতার বলে কত বলীয়ান্!
অবাক্ হইবে শুনিলে সে কথা—
স্বদেশের তরে কি মহাপ্রাণতা!
স্বার্থ সুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন
শত শত নর করি প্রাণপণ,
যুঝিছে সমরে নাশিছে অরাতি,
অদম্য উৎসাহে রণমদে মাতি।
মহাবল করী—মুষিকের করে
পরাস্ত মানিছে সম্মুখ সমরে।
রণ-বিশারদ—ব্রিটিশ কেশরী
ফরাসী জর্ম্মণ উঠিছে শিহরি!
বিশ বছরের সভ্যতার বলে
কিবা সুনিপুণ সমর কৌশলে!
জলযুদ্ধে কিবা সুদক্ষ জাপান
ডুবাইছে কত চীন জলযান
সসৈন্যে সাগরে,—জনমের মত;
ধন্য হে জাপান তোমার বীরত্ব!
শত শত নারী করিবারে রণ
রাজার নিকটে করে আবেদন!
মত্ত মাতঙ্গিনী—জাপান রমণী!
বীরাঙ্গনা কত—বীর-প্রসবিনী,
সমর প্রাঙ্গণে প্রাণ দিতে চায়;
'স্বদেশানুরাগ' ধন্য এ ধরায়!
অসীম সাহসে করিয়ে নির্ভর
পশিছে সমরে নির্ভয় অন্তর!
শত্রুসেনা হেরি হটিবে না রণে,
যায় যাক্ প্রাণ দেশের কারণে।
অহিফেন সেবি—পুরুষত্ব হীন,
গেছে একেবারে অধঃপাতে চীন!
পূর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব দর্প চূর্ণ যার,
অপদার্থ এবে নিস্তেজ অসার!
অদ্ভুত জগতে চীনের প্রাচীর!
যে চীনেতে ছিল শত শত বীর,
কোথায় সে চীন—নেশার অধীন
তাই তার এত দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন!
ভাবিলে সে কথা চোখে বহে জল,
একেবারে চীন গেছে রসাতল।
আলস্য বিলাসবাসনা ও ভোগ
একবার দেশে পশিলে এ রোগ,
করে সর্ব্বনাশ! বল বীর্য্যহীন
সাধে কিগো গেছে রসাতলে চীন?
ধন্য হে জাপান! ধন্য বীরপণা,
এসিয়ায় নাহি তোমার তুলনা।
ক্ষুদ্র কলেবর—বিক্রম বিশাল!
ভেবে দেখ তুমি কি ছিলে হে কাল?
কাল চক্রে ঘুরি—চীনের পতন,
উদয় তোমাতে সুখের তপন!
কেমন বালার্ক শোভিছে ও শিরে!
আরো যে উজ্জ্বল হইবে অচিরে!
সুসভ্য সমাজে লভি উচ্চ স্থান
তুমিও জগতে হইলে প্রধান।
আজও উচ্চ হবে তারি সূত্রপাত,
সৌভাগ্য তোমার তাই সুপ্রভাত!!

হেঁয়ালি।

তিন অক্ষরে নাম মম বিদিত সংসারে,
কিন্তু পণ্ডিতেরা মোরে অধিক আদরে।
আপন কর্ম্মেতে আমি নাহি হই পিছু,
কালী কালী বিনে মম মুখে নাই কিছু।

পরের মনের কষ্ট না পারি সহিতে,
পর উপকার খাটি দিবসে নিশিতে।
টেনিসন রঙ্গবাসী বঙ্কিম স্বজন,
সকলেরি উপকার করেছি সাধন।
নামের প্রথম আর দ্বিতীয় অক্ষর,
একত্র করিলে বিজ্ঞানের সহচর।
আদি বর্ণে শেষ বর্ণে একত্র করিলে,
তখনি বলিয়া হীন সবে অবহেলে।
শেষ আর দ্বিতীয়েতে কর একত্রিত,
ছিছি বলি পলাইবে তখনি ত্বরিত।
যেখানে সেখানে থাকি মূল্যবান নই,
কিন্তু যদি চেন তবে মূল্যবান হই।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(২৬০ সংখ্যা ৩০৪ পৃষ্ঠার পর।)

আমাশয় ও রক্তামাশয়।

১। আমাশয় হইলে জোলাপ লওয়া উচিত। অপক্ক বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড় ও মিছরির গুঁড়া সহ সেবন করাইবে। আকন্দ মূলের ছাল চূর্ণ সেবনে আমাশয় রোগের উপশম হয়।

২। কেশুরিয়া, কচি দাড়িম, দাড়িম পাতা, আয়াপানের পাতা, কালা কর্পূর জামপাতা বা দূর্ব্বার, অথবা কুড়চি ছাল ইহার কোন একটীর রস ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করাইলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

৩। কোকশীমের পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ সেবন করিলে আমরক্ত বন্ধ হয়।

৪। চাঁপাকলার শিকড় দুই কুঁচ বাটিয়া খাইলে আমরক্ত সারে। থুল-কুড়ি নামক গাছ খলিসা মাছের সহিত ঝোল করিয়া ১ সপ্তাহ রোগীকে খাওয়া-ইলে আমরক্ত ভাল হয়।

৬। বেলশুঠী, ধাই ফুল, বালা, লোধ, গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ যোয়ান, মুতা, ও শুঠ যোগ করিয়া, সিদ্ধ করণানন্তর গাঢ় ক্বাথ ছাঁকিয়া মধুসহ মুহুর্মুহু অবলেহন করাইলে শিশুগণের আমাশয় রোগ নিবৃত্তি হয়।

৬। বেলশুঠী, ইন্দ্রযব, বালা, মোচ-রস, মুতা এই সকলে মিলিত ২ তোলাকে ঈষৎ কুটা করিয়া ১৬ তোলা জলে সুসিদ্ধ হইলে কেবল দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলে শিশুদের মাংস ও রক্তক্ষরণ সহ গ্রহিণী ৪।৫ দিবসে আরোগ্য হয়।

৭। প্রথমে একটী নূতন হাঁড়িতে /৫ সের জল দিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে জল ফুটিতেছে, সেই সময় ঢেঁকিতে কুটা /১ সের কুড়-চীর ছাল ফেলিয়া দিয়া খাঁটিতে থাকিবে। যখন দেখিবে বেশ সিদ্ধ হইয়া পাঁচ পোয়া আন্দাজ জল আছে, সেই সময় নামা-ইবে। পরে সেই রস বস্ত্রের দ্বারা

ছাঁকিয়া লইয়া দেখিবে যে পাঁচ পোয়া হইয়াছে কিনা। অনন্তর এক ছটাক ঐ রস এক কাঁচ্চা মধুর সহিত মিলিত করিয়া সকাল ও সন্ধ্যা দুইবার খাওয়াইবে। তিনদিন পরে একবার করিয়া খাওয়াইবে। এইরূপে সাত দিন খাওয়াইলে আমরক্ত আরাম হয়।

৮। জ্বর অসম্বে তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ কিছুদিন পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

৯। তিন চারি দিন তেলাকুচা পত্রের রস ১ তোলা পরিমাণে আমাশয় রোগীকে সেবন করাইলে আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

১০। শুক চিড়ে ৮ তোলা ঘৃত দ্বারা মাখিয়া রাত্রিকালে আমাশয় রোগীকে ভক্ষণ করাইয়া জল পান করিতে দিবে না। এইরূপ ৩ বা ৪ দিন ব্যবহার করাইলে ভয়ঙ্কর আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

১১। ৪ তোলা ইষবগুল জলে ভিজাইয়া সেই জল চিনির সহিত দিবসে দুই তিনবার খাইবে। পাঁচ ছয় দিন ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

১২। ইষবগুল কতকটা বাছিয়া লইয়া গালে জল দিয়া তাহা গিলিয়া ফেলিলে আমাশয়, এমন কি রক্তামাশয় ভাল হয়। রাত্রিকালে শয়নের সময় ও প্রাতে সেবন করা প্রশস্ত। বেশীভেদ হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করিতে হয়।

১৩। খই, যষ্টি-মধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধু-সহ মাড়িয়া এক চামচে আতপ চালের জলসহ পান করাইলে শিশুদিগের আমাশয় আরোগ্য হয়।

রক্তস্রাব।

১। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে শ্বেতদূর্ব্বার রস, ফটকিরির জল কিম্বা চিনি সংযুক্ত দুগ্ধের নস্য লইলে উপকার হয়।

২। ফটকিরি ৴০ আনা ও ছাগ দুগ্ধ ৶০ পোয়া সমপরিমাণে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া দিবায় তিনবার সেবন করিলে, রক্তভেদ, রক্ত বমন, রক্ত প্রদর রোগের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

৩। ছাগদুগ্ধ ও আতপ চাউলের চেলোনি জল একত্র মিশাইয়া পান করিলে রক্ত উঠা ক্ষান্ত হয়।

৪। পুরাতন চামড়া জল দিয়া থেঁতো করিয়া ক্ষতস্থানে পটী বান্ধিয়া রাখিলে কিম্বা মুখে চিবান দূর্ব্বা ঘাসের রস অস্ত্রাদি জন্য ক্ষত (কাটা) স্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ ও বেদনা নিবারণ হইয়া কাটা স্থান যোড়া লাগিয়া যায়।

৫। যদি কোন অস্ত্রাদি বা আঘাতাদি দ্বারা রক্তবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া নিয়ত শোণিত স্রোত বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে বরফ অথবা ফট্‌কিরি মিশ্রিত জল বারংবার সিঞ্চন

করিলে শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত রোধ হয়।

৬। আয়াপানের পাতার রস পান ও ক্ষত স্থানে প্রদান করিলে রক্ত রোধ হইয়া বেদনাদি নিবারণ হয়।

৭। ফট্‌কিরির গুঁড়া, বা তামাকের পাতা লাগাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৮। পাথুরিয়া কয়লা জলে ঘসিয়া ক্ষত স্থানে দিলে কাটা ঘা ভাল হয়।

৯। কাটিবা মাত্র কাটা স্থানে গাঁদা পাতার রস দিলে কাটা ঘা যুড়িয়া যায়, কোনও বেদনা হয় না।

১০। মাখন ও তিল তৈল সম পরিমাণে লইয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ হয়। (ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৬০ সংখ্যা ২৭২ পৃষ্ঠার পর।)

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

নবাব ওয়াজাদ্‌ আলি সা কৃত গান।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

৺ ৺ { ৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺
ঋ গ { সা ঋ সা ম | গ গ ম ম | প প
আ- রে- { এই- সি নি- মক্ | হা- রা- মি মু- | ল- ক্

৺ ৺ | । ৺ ৺ || } ৺ ৺ ৺ ৺ | ।
প ম | গ ঋ গ || } ম ম প প: | প
বি- গা- | রা | আ- রে || } (১ম) হ- জ- র- ৎ | হী-
(২য়) গ- লি গ- লি | রে।

৺ ৺ | । ৺ ৺ | । ৺ ৺ || } ৺ ৺ ৺ ৺ |
সা· নি | ধ প ম | ম গ ঋ গ || } ম ধ ধ ধ |
ত্তি- | হি ল- গুণ- | কো | আ- রে || } ম- হ- ল- ম- |
রে | পা- থ- রি- | য়া। |

। ৺ ৺ | । ৺ ৺ | ৺ ৺ | ৺ ৺ || }
ধ নি সা· | নি ধ প | ম গ | ঋ গ || }
হ- ল- মে | বে- গ- ম | রোঁ- য়ে- | আ- রে || }

ঝিঁঝিট মিশ্র।

একতালা।

শ্রীচরণ দাস বৈরাগী কৃত গীত পরিবর্ত্তিত ল ও স।

{ + । । । । । । । । । । । | +। । । । ।
{ ঋ গ ঋ ঋ প প গ গ ম ঋ সা সা | সা সা ম ম গ
{ এং- লা- তে র· ত- ন, হা- রা- ও- না ম- ন, | হ- রি- হ রি ব-

।	।।	।	।।।	+।।	।	।	।	।	।	।	।	+।	।
ম	ধপ	ম	গ	সা'	নি	ধ	নি	ধ	প	ম	ম	ম	প
ল	ব-	দ-	নে।	হ-	রি	বোল,	হ-	রি-	বোল,	ব-	ল	শ-	ঙ্খ-

।	।	।	।	।	।	।	।।।
প	প	প	ধ	ম	প	ম	গ
নে,	স্ব-	প-	নে,	জা-	গ-	র-	ণে ॥

	+।	।	।	।	।।	।	।	।	।	।	।
	গ	গ	গ	গ	গম	ম	প	প	প	প	প
(১ম)	শ্রী-	হি-	কে-	র	স্মুখ	হ'	ল-	না	ব-	লি-	য়ে,
(২য়)	ম-	নে	ক-	র	সেই	দি-	ন	ভ-	য়-	ঙ্ক-	র,
(৩য়)	ত্য	জ্য	ক-	রে	যে	দিন	যা-	বি-	রে	সং	সার,
(৪র্থ)	চ-	রণ-	ব-	লে	গ-	তি	নাই	হ-	রি	বি-	নে,

+।	।	।	।	।।	।	।	।	।	।	।
প	সা'	নি	সা'	ধনি	প	ধ	প	ম	গ	গ
তা	ব-	লে	কি	নাম	র	হি-	বি	ভু	লি	য়ে,
অ-	বশ	অঙ্গ	যে	দিন,	হ-	ই-	বে	তো-	মা-	র,
কো-	থায়	র-	বে	তোর	পু	ত্র	প-	রি-	বা-	র,
হ-	রি	না	ম	সু	ধা	পিও-	রে	ব-	দ-	নে,

×।।	।	।।।	।	।	।	।	।
সা'	নি	ধ	নি	ধ	প	ম	ম
যাঁর	না	মে,	যাঁর	প্রে	মে,	হ'-	লেন
সেই	দিন	ব-	দনে	য	দি	ব-	লতে
সং	সার	অ-	সার	আঁ-	খি	মু-	দলে
কলি-	তে	ত-	রাতে,	হ-	রি	না	ম

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	প	প	প	প	ধ	ম	প	ম	ম	গ	গ
শু-	ক-	দে	ব	সু	খী,	না-	র-	দ-	বি-	রা-	গী-
পা-	র	না	ম,	হ-	রি	পূ-	রা-	বে	মন	স্কা-	ম,
অ-	ন্ধ-	কা	র,	ক-	র	হ	রি	প	দ	সা-	র,
ব্র-	হ্ম-	ম-	য়,	যে	জন	জা	নে	রে	নি	শ্চ	য়,

+।	।।	।।	।	।।।	।	।
গ	ম	সা'	নি	সা'	ম	ম
ম-	হা-	দেব	যো-	গী,	বে-	ড়ায়
ভ-	রে	যাবে	মো	ক্ষ	ধা	ম,
স্ব-	দি	যাবে	ভ-	ব	পা-	র
তা	র	কি	ভ	বে	ভ-	য়,

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	প	প	প	প	ধ	ম	প	ম	গ
শ্মা-	শা-	নে-	ম	শা	নে,	যো	গ-	ধ্যা-	নে।
তো-	মায়	লবে-	না,	ছোঁ-	বে-	না,	শ	ম-	নে।
স্নে-	থ	রতি-	ম-	তি	হ-	রির	চ-	র	ণে।
সে-	জন	তরি-	তে	পা	রি	বে	তু-	ফা-	নে।

পিতৃ-ভক্তি।

গগনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—উর্চ্চতর স্থানে যাঁহার পবিত্র আসন; যিনি পরম গুরু স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীদেবীর পূজ্যতম দেবতা; যিনি নিরাশ্রয় বাল্য-জীবনের আশ্রয়; এবং যে স্নেহময় দেব-তার অসীম, অপরিমেয় ও অতুলনীয় স্নেহে আহার সাজ সজ্জা বিদ্যাশিক্ষাদি নানা-বিধ মঙ্গল লাভ করিয়া আজ আমরা জগতে মানব মানবী বলিয়া পরিচিত হইতেছি; সেই মঙ্গলময় প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি যে কি প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। এমন কি আমার এই ক্ষীণ মস্তিক যে সে বিষয় ধারণা করিতেও নিতান্ত অক্ষম ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে পিতা অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া নিজের ক্লেশের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সন্তা-নকে সুখী, ধনী, মানী, জ্ঞানবান্, বুদ্ধি-মান্ ও যশোগৌরবে বিভূষিত দেখিয়া আত্মহারা হইয়া আপনাকে সুখী ও ধন্য জ্ঞান করেন; সেই দয়াময়ের প্রতি যে কি প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অসাধ্য। পিতা যে অপত্য-বিচ্ছেদ শোকের বশীভূত হইয়া নিজ জীবন দিতেও অপ্রস্তত নহেন, তাহা আমরা মহারাজ দশরথের অকাল-মৃত্যুতে বেশ অনুভব করিতে পারি। এমন যে স্নেহা-ধার পিতা; আমরা অধম, আমরা কি তাঁহার স্নেহরসের একধারারও ধার শুধিতে পারি? পিতা যে কি পরম বস্তু; আমরা অন্ধ, আমরা কি তাহা চিনিতে পারি? আমরা কি সেই দেবতার মহত্ত্ব অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি; না তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত প্রেম বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ থাকি? এই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করা মৎতুল্য জ্ঞানহীনা অবলা জনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব এবং এই পিতৃভক্তি বিষয়ক রচনা কি এই সামান্য ভক্তিহীনা মানবীর নির্জ্জীব লেখনী প্রকাশ করিতে পারে? পরম ভক্ত না হইলে কি কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে

সমর্থ হয়? ভক্তির বলেই ধ্রুব প্রহ্লাদের নিকটে হিংস্র জন্তুগণও শান্তভাব ধারণ করিয়া তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল; আর সেই ভক্তি এবং বিশ্বাস বলেই তাহাদের ঈশ্বর দর্শন লাভ হইয়াছিল। এই ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া দেবর্ষি নারদ বীণাসহযোগে হরিগুণগাথা গাহিতে গাহিতে ভক্তিতেই উন্মত্ত হইয়া আপনার হীনতা ও বীণার শ্রেষ্ঠতা অনুভব করত নির্জ্জীব বীণাকে সজীব ভাবিয়া বীণার নিকটে ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিতেন। আর বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রভাবেই নারদ সামান্যা দাসীপুত্র হইয়াও আজ দেবপুত্র বলিয়া সংসারে পূজিত। বৈষ্ণবেরাও বলিয়া থাকেন 'ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। তাহাতেই বলি আমরা পিতৃভক্তির বিষয় মুখে হাজার বক্তৃতা করি, কিম্বা সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি না কেন, "পিতা যে পরম দেবতা, ইহা বিশ্বাস ভিন্ন ও পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ভিন্ন," গোপরাণীর সামান্য রজ্জু দ্বারা গোপাল বন্ধনের ন্যায় দুই অঙ্গুলি ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ের একত্র যোগ ভিন্ন, কেবল বিশ্বাস কিম্বা কেবল ভক্তিদ্বারা যে আমরা সেই পরম পিতাকে পাইতে পারি না, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই যে, আমাদের পূর্ব্বতন সুচতুর আর্য্যঋষিগণ বিশ্বাসরূপিণী যশোদা, ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভে এক কৃষ্ণ দুই অংশে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব বিশ্বাস ভক্তির যোগ ভিন্ন যখন পূর্ণ প্রেমের আবির্ভাব হয় না, তখন আমরা অবিশ্বাসী এবং ভক্তিহীনা, সুতরাং প্রেমহীনা হইয়া প্রেমময় পিতার প্রতি কি প্রকার ভক্তি সম্ভব, তাহা কিরূপে সম্যক্ উপলব্ধি করিব? আমরা অবিশ্বাসী বলিয়াই ত নিয়ত শুনিতে পাই পিতার ভর্ৎসনায় কত সন্তান আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকারে আত্মহত্যা করিয়া মনের দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। যদি আমাদের হৃদয়ে একবিন্দু বিশ্বাস কিম্বা ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম যে পিতা আমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত ভর্ৎসনা করেন অথবা শাস্তি দিয়া থাকেন। আমরা অবিশ্বাসী অন্ধ বলিয়া নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া মঙ্গলময় পিতাকেই কেবল শাস্তিদাতা ভাবিয়া অশান্তিতে ডুবিয়া যাই। আমাদের এই অন্ধতা ও অজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই "ত" মহর্ষি বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি ভবিষ্যৎজ্ঞানী মহাপুরুষগণ ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাসে পিতৃভক্তির জাজ্বল্য প্রমাণ অঙ্কিত করিয়া নর নারীর অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাম, পুরুরাজ, ভীষ্মদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের পিতৃভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। শ্রীরাম চন্দ্রের হস্তগত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্র

পুরুরাজের নিজের যৌবন দিয়া পিতার জরা ভার গ্রহণ এবং ভীষ্মদেবের অমানুষিক স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মানবের অলৌকিক ক্ষমতা স্মরণ করিয়া, সেই সমস্ত অতীতের কথা আমাদের পক্ষে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়, অথবা তাঁহাদের কার্য্য সমূহকে আমরা দেবলীলা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি আমরা একান্ত বিশ্বাস ভক্তির সহিত "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" ইহা ভাবিতে পারি, তাহা হইলে পিতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের কোন কার্য্যই অসাধ্য বোধ হয় না। তখন সর্ব্বময় দেবতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে জীবন যাক্ বা থাক্ সে জ্ঞান থাকে না; তখন পিতৃ আজ্ঞা পালনেই স্বর্গসুখ মনে হয়। পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানের পক্ষে এ কার্য্য করিব কি না, ইহাতে আমার পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবে তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না; পিতৃ-আজ্ঞাই তাঁহার প্রতি ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তান বুঝেন যে পিতাকে প্রীতিযুক্ত রাখিতে পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব যদি এই জাগতিক পিতার প্রীতিতেই সেই জগৎপিতার সন্তোষ সাধন হইল, তখন পিতার আদেশ হাজার দুরূহ হউক না কেন, তাহার বিচার না করিয়া সর্ব্ব স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে তাহা পালন করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি কোনও পিতার অসাধু কার্য্যই প্রিয় হইয়া থাকে, তবে তাহাও কি দেবাদেশ বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? এরূপ জিজ্ঞাস্য স্থলে বলা আবশ্যক যে, সে স্থলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পিতার সেই অসাধু ইচ্ছা দূর না হয়, ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় ধীর স্থিরভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যুক্তি প্রদান দ্বারা পিতার চিত্তের মলিনতা মুছিয়া দেওয়া যে পিতৃভক্ত সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মানব মাত্রেরই সময়ে সময়ে ভুল, ভ্রান্তি ভ্রম, প্রমাদ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ধীরমনে এবং সুবিবেচনার সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করা বুদ্ধিমান্ সন্তানের নিতান্ত আবশ্যক। আর পিতৃভক্তি বলিতে কেবল যে সর্ব্বদা পিতার মন যোগাইলেই পিতৃভক্তি সম্পন্ন হইল, আমরা তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু "পিতরি প্রীতিমাপন্নে" বলিতে কেবল যে কার্য্য করিলে পিতার আত্মার প্রীতি জন্মে, যাহাতে পিতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করাকেই আমরা বাস্তব পিতৃভক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি; আর তাহাতেই সর্ব্বদেবতা প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই

বুঝা যাইতেছে যে এক পিতৃভক্তি হইতে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বময় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন, সুতরাং তাহাতে সন্তানেরও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে। আর পিতৃভক্ত সন্তানের গুণে পিতারও পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সুজ্ঞানপরায়ণ সন্তানের গুণে যে পিতা মাতার সদ্গতি হইতে পারে, কপিল দেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। (ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কৃপায় আমার জীবনে এক শুভ বা সুখ-স্মরণীয় দিন আসিয়াছে। তাই এমন দিনে আমি আমার স্নেহময়ী দেশীয়া ভগিনীকে আমার হৃদয়ের গভীর প্রীতি উপহার দিতেছি, ভরসা করি তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন—তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীকে অধিকতর সুখী করিবেন।

আজিকার দিন "আমার জীবনের এক শুভ বা সুখস্মরণীয় দিন" কিসে, সেই কথা আগে বলিতেছি। আজি কালি ইংরাজ রাজের রাজত্বে আমাদের রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, তারের খবর, ডাকঘর প্রভৃতি (আমাদের ভারত-বাসীর জীবনে) যুগযুগান্তরের অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ইংরাজরাজের প্রসাদেই বহুদূরবর্ত্তী দেশ সকল ক্রমশঃ কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে। এই সুবিধার জন্য ভগবানের ভক্ত সন্তানেরা অনায়াসেই স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ করিয়া ভগবৎসৃষ্ট সুন্দর, মহৎ ও অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল দেখিতে পাইতেছেন; চক্ষের সফলতা, জ্ঞানের তৃপ্তি এবং ভক্তির প্রবলতা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতেছেন। এই সকল কারণে অপরিচিত স্থান, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি দেখিবার সাধ আমার মনে বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল। কিন্তু মনের সাধ "বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল" হইলে কি হয়, এ কে—সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বল, আমি বঙ্গবাসিনী।—অনেক বঙ্গবাসিনীর মত আমার সঙ্গেও বিনা কৈফিয়তে চন্দ্র সূর্য্য সব সময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, তার পরে আরও নানারকম অসুবিধা, সুতরাং আমার পক্ষে "স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ" কতদূর সম্ভব, তাহা আমার স্বদেশীয়া, সহৃদয়া ভগিনীকে খুলিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি মনে মনেই সব বুঝিতে পারিতেছেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমার পাঠিকা ভগিনী যাহাই মনে করুন আর আমি যাহাই মনে করি, এজগতে ভগবানের ইচ্ছা হইলেই "অসম্ভব" সম্ভব হইয়া পড়ে। তাই দেশ-ভ্রমণটা দৃশ্যতঃ আমার পক্ষে যতই অসম্ভব

হউক না কেন, ভগবানের কৃপাতেই আমি কার্য্যতঃ বাসভূমি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিঘ্নহারী দেবতা আমার সহস্র বিঘ্ন কাটিয়া সত্যসত্যই আমাকে বাঙ্গালার প্রেসীডেন্সী বিভাগ হইতে ছোটনাগপুর বিভাগ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন!—যে সকল ভগিনী বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে বাস করেন, তাঁহারা বোধ হয় আমার এই "ভ্রমণ বিবরণে" হাসি থামাইতে পারিতেছেন না; কিন্তু আমি এতদিন হাওড়ার ষ্টেশন পর্য্যন্ত কখনই দেখি নাই, তাই এই টুকু আসিয়াই আমার মনে বিদেশ ভ্রমণের সুখ অনুভূত হইতেছে।

এ পত্রে যাহা কিছু লিখিব মনে করিতেছি, সে সব লিখিবার আগে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা (?) আমার মনে জাগিতেছে, পাঠিকা ভগিনীকে অনুগ্রহ করিয়া সেই কথাটী আগেই শুনিতে হইবে। কথাটী বিশেষ কিছু নয়; যে দিন পশ্চিমে আসিবার জন্য প্রথম হাওড়ার ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম, আত্মীয় স্বজনদিগের বিচ্ছেদ এবং পশ্চিম ভ্রমণের আনন্দে হৃদয়ে একটী মিলিত সুখ দুঃখের ছায়া পড়িয়াছিল, প্রাণের ভিতর কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব জড়াইয়া গিয়া যে দিনটী স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য আঁকিয়া রাখিতেছিল, (আমাদেরই জন্য ব্যথিত) একটী বালকের সুকুমার বিষাদক্লিষ্ট মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষে অনাহুত অশ্রু আসিয়াছিল, সেই দিনে—সেই মধুমাখা বিষাদের দিনে, আমরা অভিভাবকের নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিলাম। সে গাড়ী "রিজার্ভ" করা হয় নাই, সেজন্য দুইটী হিন্দুস্থানী মহিলাও আমাদের অধিকৃত গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের বেশভূষায় তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং অপরা তাঁহার পরিচারিকা অনুমিত হইল।—শুনিতে পাই এখনকার দিনে বিশেষ কারণ ব্যতীত অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করা "বিশেষ অসভ্যতার" মধ্যে পরিগণিত। আমার হিসাবে সামাজিক স্ত্রী ও পুরুষে এইরূপ নিয়ম থাকাই আবশ্যক; কিন্তু রমণীর কাছে রমণীর মুখ চুপ করিয়া থাকিবে কি করিয়া? আমার পাঠিকা ভগিনী বর্ত্তমান আইন কানুন দেখিয়া যাহাই বলুন, রেলের গাড়ীতে আমার অধিকৃত ঘরে, স্ত্রীলোক দেখিলেই আমার কথা কহিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল হয়, এবং সে প্রবৃত্তি আমি যথাসাধ্য "অনুশীলন" করিয়া থাকি। সুতরাং এই দুইটী হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গেও কিছুক্ষণের মধ্যে আমার আলাপ হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে প্রয়োজন বশতঃ কয়দিন শরীরের উপরে কিছু "নিষ্ঠুরতা" করিতে হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্য কোন্নগর ষ্টেশন পার হইতে না হইতে আমার শরীরে প্রবল জ্বর আসিল। শরীরের যাতনার সহিত আমার মনেও দারুণ

অভাব অনুভূত হইতে লাগিল—যেখানে জ্বরে স্নেহময়ী মা'র স্নেহমাখা সেবা না মিলে, আত্মীয় বন্ধুদিগের "আহা" না মিলে, পীড়িত আমার জন্য একটী স্নেহার্দ্র হৃদয়ের কাতর উষ্ণ নিশ্বাস না মিলে, সেখানে জ্বর হইলে, আমার যেন শতগুণ যাতনা হইতে থাকে। তাই শরীরের জ্বর অপেক্ষা মনের অসুস্থতা সেদিন আমার বড়ই বেশী বোধ হইল। কিন্তু প্রিয় ভগিনি, বলিব কি? সেই হিন্দুস্থানী মহিলাদ্বয় সত্য সত্যই আমাকে মাতার মত স্নেহে, ভগিনীর মত যত্নে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকটে সেই অযাচিত স্নেহ মমতা পাইয়া আমার মন কৃতজ্ঞতা স্রোতে ভাসিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সকল অভাব দূর হইল; সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হইল —জ্বলন্ত সত্যের মত আমার মনে হইল এজগতের মূলবন্ধন দয়া, সহানুভূতি। সেই দয়া ও সহানুভূতির খনি প্রধানতঃ রমণী-হৃদয়। সুখের দিনে যাহাই হউক, দুঃখের দিনে মানব জগৎ দয়া ও সহানুভূতি পাইবার জন্য প্রধানতঃ রমণীহৃদয়ের প্রতি চাহিয়া থাকে—রমণী হৃদয়ের দয়া ও সহানুভূতিই তাহার সে লালসা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। একজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি ফাদার দামিয়েনের দয়া, শত সহস্র সাধারণ রমণীর দয়া হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও, দয়া প্রধানতঃ নারী-হৃদয়ের সম্পত্তি। আমি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, ভগবানের প্রদত্ত—আমাদের মা বিশ্বজননীর প্রদত্ত দয়ারূপ অমূল্য রত্নের সদ্ব্যবহার, এই হিন্দুস্থানী মহিলা দুইটীর মত আমরাও যেন করিতে পারি; ইঁহাদের দয়া ও স্নেহে আমার সন্তপ্ত হৃদয় যেমন আরাম লাভ করিল, আমরা সকলেই যেন পরের সন্তপ্ত হৃদয়ে এমনি আরাম ঢালিতে পারি —ইহাই রমণী জীবনে এক প্রধান সুখ। আমি প্রবাসের পথে, ভগবতী বিশ্বজননীর কৃপায় এই সুশিক্ষা লাভ করিলাম আর আমার স্নেহময়ী ভগিনী বামাবোধিনীর অনুগ্রহে লব্ধ জ্ঞান টুকু পাঠিকা ভগিনীর কাছে বলিয়া কৃতার্থা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যুগান্তর—সামাজিক উপন্যাস, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রি-বিরচিত, মূল্য ১।০ আনা। এই পুস্তকখানি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা পরিমিত, অতি সরল সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত এবং ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পরিবারে ও সমাজে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিবিধ চিত্রে পরিপূর্ণ। ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না এবং এতৎপাঠে পাপ ও দূষিত দেশাচারের

প্রতি ঘৃণা এবং সাধুতা ও সমাজসংস্কারের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপিত হয়। বস্তুতঃ শাস্ত্রী মহাশয় মধুর ভাষায় গল্পচ্ছলে উপদেশ দিবার কৌশল এই সুন্দর গ্রন্থখানি দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় হইবে, অবশ্যই আশা করা যায়।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ সম্পাদিত, মূল্য ১৲ টাকা। সম্পাদক একটী সুন্দর সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়া ধর্ম্মসাহিত্যজগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত। গীতার প্রকৃত মর্ম্ম পাঠকদিগের হৃদ্গত এবং এতৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য সম্পাদক যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৩। গুরু ও সাধনতত্ত্ব—শ্রী কালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ধর্ম্মসাধন ও ভক্তিতত্ত্বের অতি গভীর বিষয় সকল যেরূপ সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এরূপ বিষয় সাধারণের বোধগম্য হইবার নহে। যাঁহারা শ্রমশীল সত্যানুসন্ধায়ী, ইহা হইতে অনেক সত্য লাভ করিতে পারিবেন।

৪। রঘুবংশ, দ্বিতীয় ভাগ শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রথম ভাগের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে যে অন্তরের ধন্যবাদ দিয়াছি, এবারে তাহা আরও শতগুণে না দিয়া থাকিতে পারি না। মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় পরিচ্ছদে শোভাহীন হয় নাই একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যেরূপ সুললিত কবিতায় অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইহা অনুবাদ বলিয়াই বোধ হয় না, আমাদের প্রিয় কবির কবিত্বের ইহা সামান্য প্রমাণ নহে। উদ্ধৃত কবিতাদি সংযোগে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৯ই মার্চ্চ কালা বোবা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে; হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সার আলেকজণ্ডর মিলার, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি মহো-

দয়গণ বক্তৃতা করেন। ছাত্রদিগকে মেডাল ও বিবিধ মনোরম বস্তু পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

২। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে ১৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৩। বিবি আনি বেসান্ট কলিকাতার নানা স্থানে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

৪। আগামী গ্রীষ্মকালে রুষীয় সম্রাট্ সপত্নীক ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

৫। সার চার্লস ক্রস ওয়েট্ ষ্টেট সেক্রেটরীর কাউনসিলের মেম্বার নিযুক্ত হওয়াতে সার আণ্টনী ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট হইলেন, সার আলেকজাণ্ডার মেকেন্‌জি বাঙ্গালার ছোট লাট হইবেন।

৬। সার টি মাধুস্বামী অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ২০০০০ টাকা দাতব্যে ব্যয় হইবে।

৭। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বিনা তারে তাড়িত চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা ঠিক হইলে বাঙ্গালীর বড় গৌরব।

৮। বিয়ানা নগরের জোসেফ ট্রেল্ নামক এক বৃদ্ধ ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তত্রত্য বিজ্ঞান মন্দিরের সাহায্যার্থ প্রায় ৪৫০০০০০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৯। চীন জাপানীগণের মধ্যে সম্প্রতি একটী যুদ্ধ হয় তাহাতে চীনদিগের ২০০০৫ জাপানীদিগের ১৯৬ জন সৈন্য হত হইয়াছে। জয় জাপানীদিগেরই।

১০। মাতাজী প্রতিষ্ঠিত মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হউক আমাদের এই প্রার্থনা।

১১। রামপুরের নবাব আউডের বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী উৎকট পীড়াক্রান্ত। তাঁহার পীড়ার একটু উপশম হইতেছে, ঈশ্বর কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হউন।

১৩। রায় সূর্য্যমল ঝুমুঝুমওয়ালা বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন ধন-কুবের ছিলেন এবং সৎকর্ম্মে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

বামারচনা।

বসন্ত কোকিল।

রজত জ্যোছনা-বাস ধরণীর তলে
গুটায়ে যামিনীনাথ ল'য়ে তারা দলে।
পাণ্ডুল বরণ ধরি
নভস্তল শূন্য করি
ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে।

সে সময়ে পিকবর
তোমার মধুর স্বর
ছড়ায়ে অমিয় রাশি মরতের তলে
দিগন্ত কাঁপায়ে মহাশূন্যে ভেসে চলে।

২

তরুণ অরুণ রাগ ঊষার মাথায়,
ধীরে ধীরে সমীরণ
বুলি বুলি ফুল বন
ফুল সনে খেলা করি সৌরভ ছড়ায়,
ফুলের ভূষণ অঙ্গে
ধরণী পরেন রঙ্গে,
ঊষার মোহিনী মূর্ত্তি জগৎ হাসায়
তখন ভাসাও বিশ্ব সঙ্গীত-ধারায়।

৩

প্রখর ভানুর করে তাপে ধরাখান,
তাপিত ধরণীবাসী
উত্তপ্ত বালুকা রাশি
রৌদ্রের প্রতাপে প্রাণ করে আন চান,
হইতে গেহের বা'র
পরাণ চাহেনা আর,
তুমি কিন্তু তরুকুঞ্জে খুলি মনঃপ্রাণ,
গাহিতেছ কলকণ্ঠে সুমধুর গান।

৪

সম্বরি কিরণমালা ভানু অস্তে যায়,
ধরণী শীতল যবে সুস্নিগ্ধ ছায়ায়;
নবীন পল্লব গুলি
বায়ুভরে হেলি দুলি
ঝর ঝর করিতেছে শাখায় শাখায়
নীল আকাশের গায়,
রক্তিম বরণ ভায়,
দুএকটী তারা উঠি মিটি মিটি চায়,
সুখে তুমি গাও সেই মোহিনী সন্ধ্যায়।

৫

সুপ্ত ধরা পূর্ণিমার গভীর নিশায়
সুষুপ্ত জগৎ জন
কার্য্য ত্যজি অচেতন
ভুলি যত্ন, চেষ্টা, প্রেম, স্নেহ মমতায়,
কেবল গগন তলে
অগণ্য তারকা জলে
তার মাঝে জাগে শশী অতুল শোভায়,
আর জাগে সমীরণ
জাগে যুম্ন ফুলবন
বাসন্ত জ্যোছনা সুখে মাখি সর্ব্ব গা'য়;
তোমার মধুর স্বরে
নীরবতা ভঙ্গ ক'রে
সুষুপ্ত ধরণী খানি যতনে চিয়ায়,
মাতাও জগৎ সেই গভীর নিদ্রায়।

৬

এ আনন্দ রাশি কোথা পেলে পিকবর!
বিষাদ কালিমা রেখা
যদ্যপি থাকিত লেখা
স্মৃতি পটে, থাকিত না সুমধুর স্বর,
তুমি সদানন্দ চিত,
আমি শত ভয়ে ভীত,
সংসার আবর্ত্ত মাঝে কাঁপি থর থর,
এই উঠি এই পড়ি
ভাগ্য সনে জড়াজড়ি
করিয়া কাটাই কাল হীন ক্ষুদ্র নর,
আশা ও নিরাশা দুটী
সদা করে ছুটা ছুটী
হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ চির সহচর,
সংকীর্ণ অন্তরে বাঁধি আসক্তির ঘর।

৭

জগতে তুষিতে তুমি ধরেছ জীবন,
তুমি সাধু মহাপ্রাণ,
বসন্তে মধুর গান
গাহিয়া করহ তুমি সুধা বরিষণ,
যদিও অল্পায়ু ধর,
তবু ওহে পিকবর,
দীর্ঘ আয়ু চেয়ে তব সুখের জীবন!
(আমি) দীর্ঘ-আয়ু তব ঠাঁই
ও গুণ শিখিতে চাই,
কি করিলে হবে মন তোমার মতন,
বিনাশি কুচিন্তা রাশি
সদানন্দ-নীরে ভাসি
যত দিন বাঁচি সুখে কাটাব জীবন।
সুন্দর মধুর গীতি
গাহি সুখে নিতি নিতি
সুধাস্বরে পিকবর! তোমার মতন
বিশ্বজন মন প্রাণ করিব হরণ। কু, স্বা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৩ সংখ্যা | চৈত্র ১৩০১—এপ্রেল ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক—গত ২৩এ মার্চ্চ বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সার আলেকজণ্ডর মিলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পত্নী স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

দান—(১) ডুমরাওনের মহারাণী লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন, এই টাকায় ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রীদিগের জন্য গৃহ প্রস্তুত হইবে। (২) বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জেলার বেলগড়িয়া গ্রামে এক চিকিৎসালয় স্থাপনজন্য ২৮ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (৩) জেম্স ডিলওয়ার্টা মৃত্যুকালে প্রায় ২০ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ নিউজিলাণ্ডে দরিদ্র বালকদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয়িত হইবে।

বসন্তের নিবারক—এবার ফাল্গুন চৈত্রে কলিকাতায় বসন্তে মৃত্যুসংখ্যা সপ্তাহে একশত হইতে দেড় শতের উপর উঠিয়াছে, সহরময় আতঙ্ক, স্কুল কলেজ তাড়াতাড়ি বন্ধ হইতেছে। গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ বসন্ত-মারীভয় দেখা যায় নাই। এই রোগ হইলে চিকিৎসা নাম মাত্র, যে বাঁচিবার বাঁচে, মরিবার মরে। কিন্তু ইহার নিবারণের কয়েকটী উপায় অনেক ফলপ্রদ:—(১) ভ্যাক্সিনেসন বা গোবীজে টীকাদান, (২) ভ্যাক্সিনিয়ম, (৩) ল্যাক্‌টস টিংচুরা এই দুই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, (৪) কণ্টিকারীর শিকড় গোলমরীচের সহিত বাটিয়া খাওয়া।

ফাঁসী দণ্ড রহিত—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ফাঁসীদণ্ডের অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা স্পেনরাজ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ কলঙ্ক দূর হওয়া উচিত।

লেডি ডফারিণ ফণ্ড—গত ২রা চৈত্র ডফারিণ ফণ্ডের দশম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন হয়। গত ১০ বৎসরে এই ফণ্ডের সাহায্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বালক ও বালিকার চিকিৎসা হইয়াছে, ১৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভারতের নানাস্থানে ৭০ টী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে এবং ১০০ জন স্ত্রী ডাক্তার এই সকল হাঁসপাতালে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন ২৪০ জন স্ত্রীলোক মেডিকেল স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। কে না এই ফণ্ডের উন্নতি প্রার্থনা করিবে?

জাহাজ ডুবি—একখান স্পেনীয় জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হওয়াতে সাড়ে চারি শত লোক মারা গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধির শিমলা যাত্রা—রাজপ্রতিনিধি সস্ত্রীক গত ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন, আগামী ৬ই এপ্রেল শিমলায় পৌছিবেন।

আমিরের ইংলণ্ড দর্শন—অনেক দিনের পর আমিরের ইংলণ্ড দর্শনে মতি স্থির হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিলাতে তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রাজপদচ্যুতি—ভরতপুরের যুবক রাজা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। রাজনৈতিক এজেণ্ট কর্ণেল ফ্রেনার আপাততঃ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

চীন জাপানের যুদ্ধ—চীন ও জাপানিদের মধ্যে আরও কয়েকটী যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে জাপানের জয় ও চীনের পরাজয় হইয়াছে।

আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম্ম—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় "বিশ্বজনিতার মন্দির" নামে এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

বারমেসে।*

কার্পাস,—লাভের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে কার্পাসের আবাদের উপযোগী ভূম্যাদি যাঁহাদিগের নাই, তাঁহারাও অঙ্গনের এক পার্শ্বে, বা উদ্যানের বেড়ায় ২।৩টী কার্পাসের গাছ দিয়া রাখিতে পারেন, তাহাতে ঘর ব্যবহারের অনেক উপকার হয়। যাঁহারা লাভের জন্য কার্পাসের আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন,

* বার মাসের চাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে অতিরিক্ত কয়টী চাসের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহাদের অবগতির জন্য কার্পাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই স্থলেই বলিতেছি। যে দেশে যত প্রকার কার্পাস জন্মে, তন্মধ্যে আমেরিকার কার্পাস ও তদুৎপন্ন তুলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেননা ঐ দেশে অতি যত্নের সহিত কার্পাসের চাস আবাদ করা হইয়া থাকে। বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরী-কৃত হইয়াছে যে, আমেরিকা হইতে ঐ কার্পাসের বীজ আনয়ন করিয়া যত্নে চাস আবাদ করিলে বিহার, আসাম, সুন্দরবন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে উত্তমরূপ তুলা জন্মিতে পারে। বালুকা ও চিক্কণ মৃত্তিকা একত্র মিলিত হইলে দোআঁশ মাটী জন্মে। যে ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং যাহার মাটী দোআঁশ, তাদৃশ ভূমিই তুলা চাসের উপযোগী। কিন্তু অধিক থাকা আবশ্যক। আমেরিকার বীজ বপন করিতে হইলে, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং অন্যান্য স্থানের বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। যে ভূমিতে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে আবাদ করিতে হইবে, মাঘ মাসে গোবরের সার ও বোদ মাটী দিয়া সেই জমি তৈয়ার করিতে হইবে এবং ফাল্গুন মাসে ঐ জমিতে তিন হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিতে হয়। কাপাস গাছের গোড়ায় জল লাগিলে বড় অনিষ্ট হয়, এজন্য দাঁড়ার উপর বীজ রোপণ করিতে হয়। যে ভূমি স্বভাবতঃ পরি-শুষ্ক এবং জল হইলেও যাহাতে জল দাঁড়ায় না, সে ক্ষেত্রে দাঁড়া না বাঁধিলে চলে না; কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে তুলার আবাদ না করাই ভাল। যাহাহউক বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ দাঁড়ার উপর একটী গর্ত্তে ৩।৪টা বীজ রোপণ করিতে হয়, যদি এক এক গর্ত্তে দুইয়ের অধিক চারা বাহির হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী মাত্র চারা রাখিয়া অবশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া অন্য স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যে গর্ত্তে কোন বীজই অঙ্কুরিত হইবে না, বা একটী চারাও বাঁচিবে না, ঐ অতিরিক্ত চারা দুইটী করিয়া প্রত্যেক শূন্য গর্ত্তে পুঁতিয়া দিবে। এইরূপে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী করিয়া চারা বাঁচিয়া গেলে ১০।১২ দিন পরে প্রতি গর্ত্তে একটী মাত্র চারা রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। কার্পাসের চারা সকল যতই বড় হইতে থাকিবে, ততই ঘাস ও আগাছা নিড়া-ইয়া ভূমি পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি বেশি ঝড় বৃষ্টি না হয় এবং জমি ভাল হয়, তাহা হইলে কার্পাস গাছে তিন মাসে ফুল ধরে। আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই কাপাসের ফল তুলিতে আরম্ভ করিবে। যদি নিয়মিত কালের মধ্যে গাছের বেশি তেজ হওয়ায় ফুল ফলের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যেক গাছের ২।১টী উপশাখা ও ডাল কাটিয়া দিতে হয়। তাহাতে গাছের তেজোহ্রাস হইয়া শীঘ্র ফুল ফল জন্মে।

ফলের মুখ স্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই গাছ হইতে ফল তোলা উচিত। ফল

তুলিবার কালে তিনটী থলিয়া রাখিতে হয়। ফলগুলিকে উত্তম, মধ্যম, অধম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটী থলিয়ার মধ্যে রক্ষা করিতে হয়। পরে কিছু দিন রৌদ্রে দিয়া তুলা বাহির করিবে। ফল তুলিবার সময় যেন তাহার সহিত পাতা বা অন্য কিছু মিশাল না হয়। যদিও তুলার চাসে প্রতি বিঘায় অধিক লাভ হয় না, কিন্তু কাট্‌তি বেশি হওয়ায় মোটের উপর অধিক লাভ হইয়া থাকে। তুলার প্রতি চাসে আবাদ খরচ বাদে ১২৲।১৩৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

আমরা যে তুলার চাস আবাদের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা আমেরিকার তুলা। তদ্‌ভিন্ন অন্য প্রকার কার্পাসের চাস আবাদ এই মাসে করিতে হয়। এ দেশীয় কৃষকগণ কার্পাসের চাস আবাদে ঐরূপ পারিপাট্য করে না; করিলে কিন্তু আশাধিক ফল পাইতে পারে।

তুলার চাস আবাদ সম্বন্ধে খনার ২।১টী প্রবাদ আছে; তাহা উভয়বিধ কাপাসের চাস আবাদেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই॥
কাপাস বলে কোষ্টা ভাই।
জাতি পাশি যেন না পাই॥"

সরিষার বপনাপেক্ষা রাইয়ের বপন পাতলা হওয়া আবশ্যক। কার্পাসের বপন বা রোপণ এরূপ বিরলভাবে হওয়া আবশ্যক, যেন এক গাছ হইতে এক গাছের কাপাস সংগ্রহ করিতে এক "নেঙ্গের" অধিক যাইতে না হয়। এক ক্ষেত্রে কাপাসের ও পাট বপন নিষিদ্ধ; কারণ পাটের গাছের জলে কার্পাসগাছের হানি হয়।

পলাণ্ডু।—পলাণ্ডু একটী উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর মসলা বা তরকারী। ভোজন করা যাহাদিগের অভ্যাস নাই, তাঁহাদিগের নাসিকার উপর গন্ধ ভাল লাগে না; কিন্তু তরকারী ও মাংসাদির সহিত উহা যাঁহারা নিয়ত ভোজন করিয়া থাকেন, উহার গন্ধ পাইলে তাঁহাদের মুখ দিয়া লাল পড়ে। ফসলাংশেও ইহা বিলক্ষণ লাভজনক। এই জন্য উহার চাস আবাদের ২।৪টা কথা এই স্থানেই বলিব।

হিন্দুগণ পলাণ্ডুকে অপবিত্র খাদ্য মনে করেন। কিন্তু উহা মৃত্তিকাজাত অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিদের কন্দস্তম কাণ্ড বা কন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে উষ্ণদেশবাসিগণের পক্ষে উহা অনিষ্টকর বোধ হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে উহার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফলে এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পলাণ্ডুর প্রচুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন।

আলু ও কপির ন্যায় পলাণ্ডুর পক্ষেও পলিমাটী উত্তম সার। এই জন্য নদী, খাল, বিলাদির তীরবর্ত্তী ভুমি বা চড়া জমিতে পলাণ্ডুর আবাদ হইয়া থাকে।

যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড কাষ্ঠহীন ও সরস, সে সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রের নিম্নে বালুকা থাকিলে অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হয়; কেননা বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা স্বতঃই শিথিল হইয়া থাকে। শিথিল মৃত্তিকাই উক্ত বিধ উদ্ভিদের বিশেষ উপযোগী।

উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া আশ্বিনের শেষে, কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথমে ছয় অঙ্গুলি জমির উভয় পার্শ্বে সারিবন্দী করিয়া ছোট পিঁয়াজের এক একটী কলি রোপণ করিতে হয়। গাছগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে খুঁড়িয়া দিবে। এই খনন এক প্রকার বিশেষ কোদাইলদ্বারা হইয়া থাকে। ঐ কোদাইলের বিস্তার চারি অঙ্গুলির অধিক নহে; উহা কেবল পলাণ্ডুর চাসেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতকালে প্রচুর শিশির দ্বারাই উহার পুষ্টি হইয়া থাকে। যদিই কোন কারণে পলাণ্ডু ক্ষেত্র অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভূমিতে ২।১ বার জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পলাণ্ডুর চাসে বিঘা প্রতি ২০৲ টাকা খরচ পড়ে। ঐ খরচ বাদেও এক বিঘার ফসলে ৭০।৭৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬২ সংখ্যা ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতের রাজা ইংরাজ। বিধাতার চরণে সহস্র নমস্কার, ভারত যদিও পরাধীনা হইয়াছে, তথাপি এক সুযোগ্য জাতি ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। যে "লোক-শিক্ষা" আর্য্যগণের পরম ব্রত ছিল—সেই যে ধনী দরিদ্র অভেদে, সেই যে ক্ষুদ্র মহৎ অভেদে, স্ত্রী পুরুষ অভেদে, লোকশিক্ষা প্রচারিত ছিল, সেই "সার্ব্বভৌমিকতা" পূর্ণ শিক্ষা এত দিন ভারতবর্ষে—আর্য্য রাজত্বের পরে এত দিন ভারতবর্ষে, কেহই বুঝিয়াছিল না। তাই বলিয়াছি যে ভারত ঘুমাইয়াছিল—ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল।

কিন্তু ভারতসমাজের এ প্রকার অসম্পূর্ণতা বিধাতার ইচ্ছা নহে—বিগত শতাব্দীতে ভারত-মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করিয়াই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, ভারতসমাজের এ প্রকার অসম্পূর্ণতা বিধাতার ইচ্ছা নহে। তাই ইংরাজ পরাধীন ভারতের রাজসিংহাসনে বসিল। সুতরাং যে ক্ষণে ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল—মোটের উপরে সে ক্ষণ অতি শুভক্ষণ। ভারতবাসী, ইংরাজ-রাজত্বেই নবজীবন পাই-.—

আবার মনুষ্যত্ব বুঝিল, আত্মোন্নতির প্রয়োজন বুঝিল, স্বাবলম্বন বুঝিল, স্বজাতীয়তা বুঝিল, স্ত্রী পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ বুঝিল, অনেক দিন যাহা জানিত না, তাহা আবার জানিল। ইংরাজ-রাজ যদি ভারতের উন্নতির জন্য কিছুই না করিয়া থাকেন, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, নারী-হিতৈষণার জন্য, ভারত ইংরাজরাজের নিকটে চির-কৃতজ্ঞ। ইংরাজ রাজত্ব ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখকর না হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজ-রাজ যে ভারত-দেহে জীবনী সঞ্চার করিয়াছেন, ভারতকে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছেন এ কথা অনেকেই "সত্য" বলিবেন।

বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগের কথা বলিতেছি। ইংরাজ-রাজ রাজত্বের সুশৃ-ঙ্খলার সহিত আগে লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করেন। ১২০৫ বঙ্গাব্দে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেসলি গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারত-বর্ষে আইসেন; তখন ভারতবাসীদিগের জন্য "দশসালা"বন্দোবস্ত স্থায়ী হইয়াছে; অন্যান্য অনেক বিষয়েও ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। আবার লর্ড ওয়েলেসলির সময়েই মহীশূরের টিপু সুলতান যুদ্ধে নিহত ও মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাজিত হওয়ায় বৃটীষ প্রভুত্ব অধিকতর নিরাপদ হইল। তাই এই সময়েই লোকশিক্ষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ভারতের সাধা-রণ লোকে আর্য্যভাষা সংস্কৃত পড়িত না, হিন্দী ও বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডী দাস, গোবিন্দ দাস, বৈষ্ণব কবিগণ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির সুমধুর কাব্য ছিল বটে, কিন্তু তাহা হইতে সাধারণ লোকের মানসিক শক্তি কিছু মাত্র বিকাস লাভ করিত না। সাধারণতঃ বঙ্গভাষার অবস্থা বড়ই হীন ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারি-দিগের বঙ্গভাষা শিখিবার প্রয়োজনে ও বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত বঙ্গভাষায় কয়খানি গদ্য পুস্তক ও কেরি সাহেবের ব্যাকরণ, অভিধান প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কেরি সাহেবের প্রধান উদ্যোগে মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপিত হইল। তাহাতে মিশনরি সাহেবদিগের উৎসাহে, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাহায্যে রামায়ণ ও মহাভারত ছাপা হয়। এত-দ্ব্যতীত এতদিন গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জনরূপ যে নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল, লর্ড ওয়েলেসলি তাহার নৃশংসতা এদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, সে প্রথা রহিত করেন।

ওয়েলেসলির কিছুকাল পরে—লর্ড মিণ্টোর সময়ে, ১২১৪ বঙ্গাব্দে (১৮০৭ খ্রীঃ) খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। দেশের লোকের সুশিক্ষা এই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল প্রচারকের উদ্যোগে (লর্ড ময়রার সময়ে) বঙ্গভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হইল।

গত শতাব্দীর প্রথম যুগের শেষভাগে ১২২৪ বঙ্গাব্দে (১৮১৭ খ্রীঃ অব্দ) এ দেশীয় লোকদিগের সুশিক্ষার জন্য কলিকাতায় হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হয়। হিন্দু কালেজ সংস্থাপন জন্য এদেশের অনেক পুরুষই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইংরেজেরা ভারতের অভ্যন্তরীণ সংবাদ যতই জানিতে পারিলেন, ভারত মহিলাগণের অবস্থা ততই "শোচনীয়" বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন। লোকহিতৈষণায় ইংরেজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাই ভারতবাসিনীর জাতীয় অবস্থা উন্নত করিতে তাঁহাদিগের মধ্যে আন্দোলন চলিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্ম প্রচারের সহিত এদেশের পুরুষদিগকে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন।

এদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এদেশীয় পুরুষগণ অনেকেই নিজেদের সামাজিক অবস্থা অনেক বুঝিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে এদেশের স্ত্রীজাতির জীবন যেরূপ বিপদাকীর্ণ ছিল, ইংরাজ রাজত্বে তাহাও দূর হইল। এই সকল কারণে দেশের সুশিক্ষিত পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীজাতির অবস্থার প্রতি মনোযোগী হইলেন। দেশীয় রমণীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অনেকেই স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা বুঝিতে পারিলেন। স্ত্রীজাতি হীনাবস্থায় থাকিলে যে পুরুষের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, একথা অনেকেরই মনে হইল।—পুরুষ জাতিকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, জীবনের সকল সময়েই যাহাদিগের সহিত বিশেষ সংশ্রব রাখিতে হয়, তাহাদিগের জীবন ও চরিত্র উপযুক্তরূপে গঠিত না হইলে, কেবল তাহাদের নিজেদের নহে, পুরুষ জাতিরও সমূহ ক্ষতি, একথা অনেকেই বুঝিলেন। এই সকল বুঝিয়া, দেশীয় পুরুষগণ রমণীর সুখ, দুঃখ, অবস্থা, উপযোগিতা ও কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান ফলে, স্ত্রীজাতিকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদিগের মানসিক শক্তি পরিস্ফুট করা, তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করা, বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথা রহিত করা, তাঁহাদিগের কেহ কেহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াও বুঝিলেন। বিধাতার করুণ দৃষ্টি তাঁহার অভাগিনী কন্যাদিগের উপরে পড়িল। বিধাতারই কৃপায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ফল ফলিল। নারীহিতৈষণার আন্দোলনেই গত শতাব্দীর প্রথম যুগ শেষ হইল অর্থাৎ প্রথম পঁচিশ বৎসর কাটিল।

ইহার পরে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। প্রথম যুগে নারী জাতির উন্নতির যে আন্দোলন হইতেছিল, দ্বিতীয় যুগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে "শেরাধনি

বহু বিঘ্নানি" একথার সত্যতা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এদেশের বামাহিতৈষীগণও প্রথমতঃ শুভ ইচ্ছা সকল করিতে গিয়া পদে পদে বিঘ্ন ও বিপদ্-গ্রস্ত হইতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ এদেশের লোকদিগকে বামা হিতৈষী ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইতে গেলে অনেকে অসম্মত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এদেশের লোক শাস্ত্র হইতে দেশাচারকে অধিকতর মান্য করে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" উপদেশ থাকিলেও "মেয়েদের লেখা পড়া দেশে চলিত নাই," বলিয়া কত ব্যক্তি আপনাদের পরিবারস্থা রমণীগনকে লেখা পড়া শিখাইতে আপত্তি করিল। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে পাছে পুরুষদিগের প্রভুত্ব খাটো হইয়া যায়, এই ভয়ে কত স্বার্থপর, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কুৎসা, বিদ্রূপ প্রভৃতি করিয়া সাধারণের বিতৃষ্ণা জন্মাইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ "স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়" এই কথা বলিয়া অনেক রমণী নিজেই লেখা পড়া শিখিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া বসিলেন।*

সহমরণ ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে গিয়াও প্রথমতঃ বামাহিতৈষীদিগকে হতাশ্বাস হইতে হইয়াছিল। সহমরণ প্রথা আর্য্য ভারত হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। ভারতবাসিগণের ধর্ম্মভাবের সহিতও সহমরণের কতকটা সম্বন্ধ ছিল, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন সহমৃতা বা অনুমৃতা রমণী বহুকাল পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত (পরলোকে) স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সহমরণ প্রথার জন্য—সহমৃতা সতীর আত্মীয়গণ সমাজে বিশেষ গৌরবান্বিত হইতেন। এই সকল কারণে সহমরণ প্রথা নিবারণ বিষয়ে অনেকেই সম্মত হইলেন না।

বহুবিবাহও আর্য্যভারতের প্রথা। বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের সময় হইতে এই প্রথা এতদূর প্রশ্রয় পাইয়াছিল, যে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে কেবল বহু বিবাহের প্রসাদাৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যেও ইহার প্রাদুর্ভাব বড় সামান্য ছিল না। এতদ্ব্যতীত বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল, পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদের

* ভারতের বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রমণী মূর্ত্তিতেই পূজিতা; ভারতের আর্য্যমহিলাগণ আদর্শ বিদ্যাবতী; গত পূর্ব্ব শতাব্দীতে রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী দেবী নানাশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন বলিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার লিখিত স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তবে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে "লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়" এ সংস্কার, স্ত্রীজাতি কোথা হইতে পাইলেন? কোনও স্বার্থপর পুরুষের উদ্ভাবিত কৌশল নয় তো?

স্বার্থপরতা প্রবল, তাঁহাদের নিকট সে প্রভুত্ব বড়ই "উপাদেয়" বোধ হইত। এই সকল কারণে বহু বিবাহ রহিত বিষয়েও এ দেশের অনেক লোক অসম্মত হইলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি চেষ্টা প্রথমতঃ এইরূপ বিফল হইল।

কিন্তু মনুষ্য শক্তির উপরে এক অজ্ঞের শক্তি আছে; জগতের সকল শক্তি একীভূত হইয়াও এক পলকের জন্য সে শক্তির প্রতিকূলে পরমাণু পরিমিত কাজটীও করিতে পারে না। ঐশী-শক্তির কথা বলিতেছি—(আমরা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিতে পারি তাহাতে অনুভূত হয় যে) এ দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য এই শক্তিই পরিচালিত হইতেছিল; তাই দারুণ বিঘ্ন বাধাতেও বামাহিতৈষীরা পরাজিত হইলেন না—বরং স্ত্রীজাতির উন্নতির নব নব উপায় বিধান হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

কতকগুলি সুমাতা।

(৪র্থ সংখ্যা।)

৬। মদালসা। রাজমহিষী মদালসা একটী সুমাতা। তাঁহার স্বামীর নাম মহারাজ ঋতধ্বজ। তাঁহার চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে রাজর্ষি অলর্কই প্রধান এবং সকলের কনিষ্ঠ। তিনি বাল্যকালেই পুত্রগণকে সংসারের অনিত্যতা এবং ভগবানের নিত্যতার বিষয় উপদেশ দিয়া নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উপদেশ দ্বারা তিনি তিনপুত্রকে পার্থিব ধনে বিরাগী করিয়া অপার্থিব মহাধনে ধনী করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ ঋতধ্বজ দুঃখিত হইয়া একদিন মহিষীকে কহিলেন যে, "তুমি এ কি করিতেছ? স্ত্রীলোক মাত্রেই নিজ তনয় ও স্বামীকে নিকটে রাখিতে চাহে। তোমার প্রকৃতিতে ঠিক্ তাহার বিপরীতাচরণ লক্ষিত হইতেছে। যাহা-হউক হে কল্যাণি! রাজ্য, প্রজা ও বংশরক্ষার কারণ কনিষ্ঠ পুত্রকে আমাকে দান কর।" মদালসা প্রিয় পতির প্রীত্যর্থে কহিলেন তাহাই হউক।" তদনন্তর একটী স্বর্ণ কবচে নিম্ন লিখিত শ্লোক কয়টী লিখিয়া অলর্ককে দান করিলেন ও কহিলেন "বৎস! দুঃখ ও বিপদের সময় এই কবচটী খুলিয়া পাঠ করিবে।" কিছুদিন পরে রাজকুমার অলর্ক কাশীরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত, অবমানিত এবং যার পর নাই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন দৈবযোগে এক দিন বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে মাতৃদত্ত কবচের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি কবচ খুলিয়া পাঠ করিলেন:—

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্য সচেত্ত্যক্তুং নশক্যতে, স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহিভেষজম্। কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুং চেচ্ছক্যতে ন সঃ, মুমুক্ষুন্ প্রতি তৎকার্য্যং সেব তস্যাপি ভেষজং। অস্যার্থ

মনুষ্যসঙ্গ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে। যদি তাহা না পার, তবে সাধু সহবাসই কর্ত্তব্য জানিবে, ইহাই বিষাদ রোগের মহৌষধি। সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত; যদি তাহা না পার, তবে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিও। মোক্ষচেষ্টাই বিপদ রোগের একমাত্র ঔষধ।”

অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণে যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি লুক্কায়িত ছিল, তাহা মহাশব্দে জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মপ্রাণা জননী স্তন দুগ্ধের মধ্য দিয়া যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুশীতল বারিসেক হইল। শ্রান্ত-কলেবর দগ্ধপ্রাণ অলর্কের প্রাণ আশাপূর্ণ হইল, তিনি অদূরে দিব্যালোক দেখিতে পাইলেন। উদ্দেশে ভক্তিভাবে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন।*

৭। মহামায়া। মহর্ষি বুদ্ধদেবের জননী শাক্য-মহিষী মহামায়া অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের চারিটী মহিষী, তন্মধ্যে মহামায়া সমধিক লাবণ্যবতী, ধর্ম্মপ্রাণা এবং স্নেহশীলা ছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। দীন দুঃখীকে দয়া, গুরুভক্তি, বিনয়, আতিথেয়তা, পতিভক্তি, পরিজনগণের প্রতি যথোচিত সৌজন্য, তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি, যথাসাধ্য পরোপকার, ও নিয়মিত দান, ধ্যানাদি প্রভৃতিগুণে ও কার্য্যে তাঁহার সুকোমল হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল এবং সমস্ত সময় ব্যয়িত হইত। এক কথায় বলিতে হইলে তিনি ধার্ম্মিক বংশের উপযুক্ত প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকায় তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধচারিণী, ব্রতপরায়ণ ও পবিত্রচিত্ত হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রবাদ আছে শাক্য বংশের কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজা, মহিষীগণ ও অমাত্যবর্গ সকলে দান ধর্ম্মার্থে এক মনোহর উদ্যানে সম্মিলিত হইলেন। সমস্ত দিন উপবাসী ও স্নান দান করিয়া সন্ধ্যাকালেই সকলে অবসন্ন দেহে শয়ন করিলেন। নিদ্রামাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে এক সুন্দর শ্বেত পদ্মের শয্যায় তিনি শায়িত আছেন, অকস্মাৎ এক মত্ত শ্বেতহস্তী দ্রুতবেগে আসিয়া শুণ্ড দ্বারা তাঁহার শয্যা বিশৃঙ্খল করিয়া নাভিদেশ বিদীর্ণ করতঃ গর্ভে প্রবেশ করিল। মহামায়া জাগ্রত হইয়া মহারাজকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি তৎশ্রবণে পরমানন্দিত হইলেন। সেই রাত্রেই দয়াময় বুদ্ধদেব মহাদেবীর পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যাহা হউক স্তনদুগ্ধের সহিত মাতৃ-প্রকৃতি যে সন্তানের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,

* বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে মদালসার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে লিখিত হইল।

তাহা এই দেবী চরিত্রে স্বচ্ছরূপ বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধের জন্মের পর মহিষী সপ্তদিন মাত্র ইহলোকে ছিলেন। সপ্তদিন বুদ্ধদেব যে স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, জীবনে তাহার দ্বারা কি কাণ্ড করিয়াছেন! মাতৃ-প্রকৃতি উৎকৃষ্ট হইলে কি শুভফল উৎপন্ন হয়, জগৎ মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছে। ধন্য সেই প্রকৃতি যাহার জন্য আজ অর্দ্ধ পৃথিবী মাতোয়ারা এবং অগণিত প্রাণী যাঁহার সম্প্রদায়ের দয়ায় জীবিত, রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে!

জাপান-সাম্রাজ্ঞী দ্বয়।

জাপানের এক সাম্রাজ্ঞী ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়া জয় করেন, তাঁহার নাম জিঙ্গু কঙ্গো। তাঁহার যেমনি রূপ, তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও মেধা, যুদ্ধ বিদ্যাতেও তিনি সুবিখ্যাত ছিলেন—এমন কি তিনি জাপান দেশের রণ-দেবতার মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি যখন সম্রাটের সহিত পরিণীত হন, তখন চীন কিম্বা কোরিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব জাপানীরা জানিত না। রাণী একদিন স্বামী মিকাডোকে বলিলেন যে দেবতারা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে "সুদূর পশ্চিমে একটী রাজ্য আছে, জাপানী সৈন্যগণ পোতারোহণে তথায় যাইবে এবং তথা হইতে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য আনিবে।" সম্রাট এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার দেবতাও মিথ্যা, তোমার কথাও মিথ্যা।"

কিছুদিন পরে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটকে বন্দী ও নিহত করিল; এই সময়ে সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সৈন্যচালনা করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। তিনি জোয়ান আব্ আর্কের ন্যায় পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে রাজ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বহুসৈন্য ও পোত সংগ্রহ পূর্ব্বক দক্ষিণ কোরিয়াতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার রাজা বিনা-যুদ্ধে তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

রাণী সোনা রূপা রেসমী বস্ত্রে ৮০খানি জাহাজ পূর্ণ করিয়া এবং স্থানীয় বড় বড় পরিবারের প্রতিভূসকল সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দেবতা প্রদত্ত স্বপ্ন সফল হইল। এই রমণী জাপানের শাসনপ্রণালী নূতন করিয়া গঠন করিলেন এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন।

জিঙ্গু কঙ্গের পরে আর নয়টী রমণী জাপানের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ইহাঁর মহিমার শতাংশের একাংশও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মেকাডোর পত্নীগণ সচরাচর অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন। অনেক দিনের পর জাপানে আর এক বরণীয়া রমণীর উদয় হইয়াছে। বর্ত্ত-

মান সাম্রাজ্ঞী হারুকো অনেকটা জিঙ্গু কঙ্গোর প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন; ইনি বর্ত্তমান সভ্য জাপানী রমণীর আদর্শ। তিনি কোরিয়া জয়ে জাপানীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং রণ-সঙ্গীত রচনা করিয়া সৈন্যদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। জাপানীরা ইউ-রোপ ও আমেরিকাবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হয়, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। ইনি জিঙ্গ, কঙ্গের ন্যায় এক নূতন জাতি গঠনের সহায়তা করিতেছেন। ইহাঁর বিষয়ে পশ্চাৎ আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মসূরিকা বা বসন্ত।

মসুর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পীড়াকে মসুরিকা বা বসন্ত বলে। হাম বা বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে, রোগীর গৃহ নির্জ্জন, রম্য ও পবিত্রভাবে রাখিবে, সর্ব্বদা ধুপ, ধুনা ও গুগ্‌গুল ইত্যাদি দ্বারা গৃহ সদামোদিত করিয়া সকলেই পবিত্রভাবে সতর্ক থাকিবে এবং কোন ক্রমে বসন্ত সম্বন্ধীয় পুঁয ও রক্তাদির সহিত সংস্রবে দূষিত হইয়া দেহকে দূষিত করিবে না। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক।

এ সময়ে চতুর্দ্দিকেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, সুতরাং এ রোগের বিশেষ ফলদায়ক, কয়েকটী মুষ্টিযোগ প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহার দ্বারা অনেকেরই উপকার দর্শিবে।

১। পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

২। রুদ্রাক্ষ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ।✓ আনা বাসি জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিনে বসন্ত উপশম প্রাপ্ত হয়।

৩। পটোল পত্র, নিম্বপত্র, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, ||০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, শেষ ✓০ পোয়া থাকিতে এই ক্বাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মদন ফল বাটিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ইহা শীতল করিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত প্রশমিত হয়।

৪। রোগীর জ্বর থাকিলে জলপান পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তী চূর্ণ মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

৫। গোক্ষুরী মূল ও অনন্ত মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত উপশমিত হয়।

৬। হলুদের গুঁড়ার সহিত উচ্ছে-পাতার রস পান করিলে হামজ্বর ও বসন্ত ভাল হয়।

৭। বাসি জলে মধু মিশাইয়া পান করিলে গুটী ও তজ্জন্য গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

৮। পটোল পত্র, খলকা, মুথা,

বাসকছাল, দুরালভা, চিরেতা, নিম্বছাল, কটুকী, ক্ষেত্রপাপড়া মিলিত ২ তোলা জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহা পান করিলে অপক্ব বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ব বসন্ত শুষ্ক হয়।

৯। টাবা লেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকিয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয়।

১০। পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলোদক সেচন করিবে।

১১। বসন্ত পাকিবার উপক্রমে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম, গুড় সংযুক্ত করাইয়া, সেবন করাইলে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও বায়ু কুপিত হয় না।

১২। বসন্তে শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, সৈন্ধব লবণের সহিত মাংসের যুষ পান করিলে উপকার হয়।

১৩। কুল চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

১৪। বসন্তে অধিক পূঁয হইলে বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইবে, কিম্বা বিল ঘুটের ভস্ম ছড়াইয়া দিবে।

১৫। বসন্তে কৃমীভয় নিবারণ জন্য সরল কাষ্ঠ ধুনা, দেবদারু, চন্দন ও অগুরু প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে।

১৬। ত্রিফলার কাথে গুগ্‌গুল দিয়া পান করিলে পূঁয নির্গত হইয়া দাহ ও বেদনা ভাল হয়।

১৭। বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থাতেই প্রতিদিন হিঞ্চেশাকের রস ৪ তোলা, ঘর্ষণ করা শ্বেত চন্দন ।৹ অর্দ্ধ তোলা, এই উভয়কে একত্র যোগ করিয়া দিবসে ২ বার পান করান কর্ত্তব্য। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র বহির্গত হয়।

১৮। হাম রোগের শেষাবস্থায় কুড় ও বাবুই মিলিত ২ তোলাকে কুটা করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করাইলে দেহে হামজন্য চিহ্ন সত্বর মিলিত হয়। ইহা দুই তিন দিন ব্যবহার করান আবশ্যক।

১৯। নিম্বছাল, ক্ষেত্রপাপড়া, আকনাদি মূল, পলতা, কুটকী, হরীতকী, রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন, বেণার মূল, আমলা, বাসক মূলের ছাল, দুরালভা, এই দ্বাদশ প্রকার মিলিত পাচন বসন্ত রোগীকে পানার্থ প্রথমাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। মুখে, কণ্ঠে বসন্ত জন্য ক্ষত হইলে আমলা ২ তোলা, যষ্টি মধু ২ তোলা এতদুভয়কে কুটা করিয়া ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ হইলে ১৬ তোলা আন্দাজ জল থাকিতে ছাঁকিয়া রোগীকে বারম্বার কুলি করিতে দিবে। ইহারদ্বারা মুখ ও কণ্ঠস্থ ক্ষতাদি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

২১। গাত্র বেদনা, শিরোবেদনা, পেট ভার বোধ, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং

বাশি থাকিলে সেই জ্বরে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এই জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয় না। প্রায় তিন বা চারি দিনে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পায়। এই সময়ে কোন ঔষধ প্রদান করা বিধেয় নহে, যাহাতে সামান্যরূপ বমন বা বিরেচন হয়, এরূপ ঔষধ প্রদান করাই উচিত।

২২। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষত শুষ্ক ও জ্বর ত্যাগ হইলে কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাখিয়া স্নান করিবে।

২৩। বসন্ত শুষ্ক হইবার সময় হইতে যাহাতে রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এরূপ পথ্য প্রদান করা উচিত।

২৪। বসন্তের মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হরিদ্রাচূর্ণ ও মাখন লেপন করিলে ক্ষত আরোগ্য হয় ও বসন্তের চিহ্নগুলিও মিলাইয়া যায়।

২৫। যে রোগীর চক্ষু মধ্যে বসন্ত হইয়া যাতনা উপস্থিত হয়, সেই যাতনা নিবারণার্থে গড় গড় ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, এই উভয়কে কুট্টা ও সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া ঈষৎ উষ্ণসত্বে সেই জলদ্বারা চক্ষুর উপর স্বেদ (Foment-ation) প্রদান করিবে। তাহাতে যাতনা নিবারণ ও রস স্থানান্তরিত হয়।

২৬। বসন্ত পাকিয়া পূঁয যাদি সঞ্চার হইলে কণ্টকাদিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পূঁয নির্গত করিবে। তৎপরে যষ্টিমধু, আমলা, হরীতকী, বয়ড়া, চালমুগরা বীজ, দারু-হরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধ-কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, গোময় ভস্ম, এই সকল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করত সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা পুটলী বাঁধিয়া বসন্তের ক্ষতের উপর মুহুর্মুহু ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা সত্বর ক্ষতাদি শুষ্ক হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বরসাধন প্রণালী।

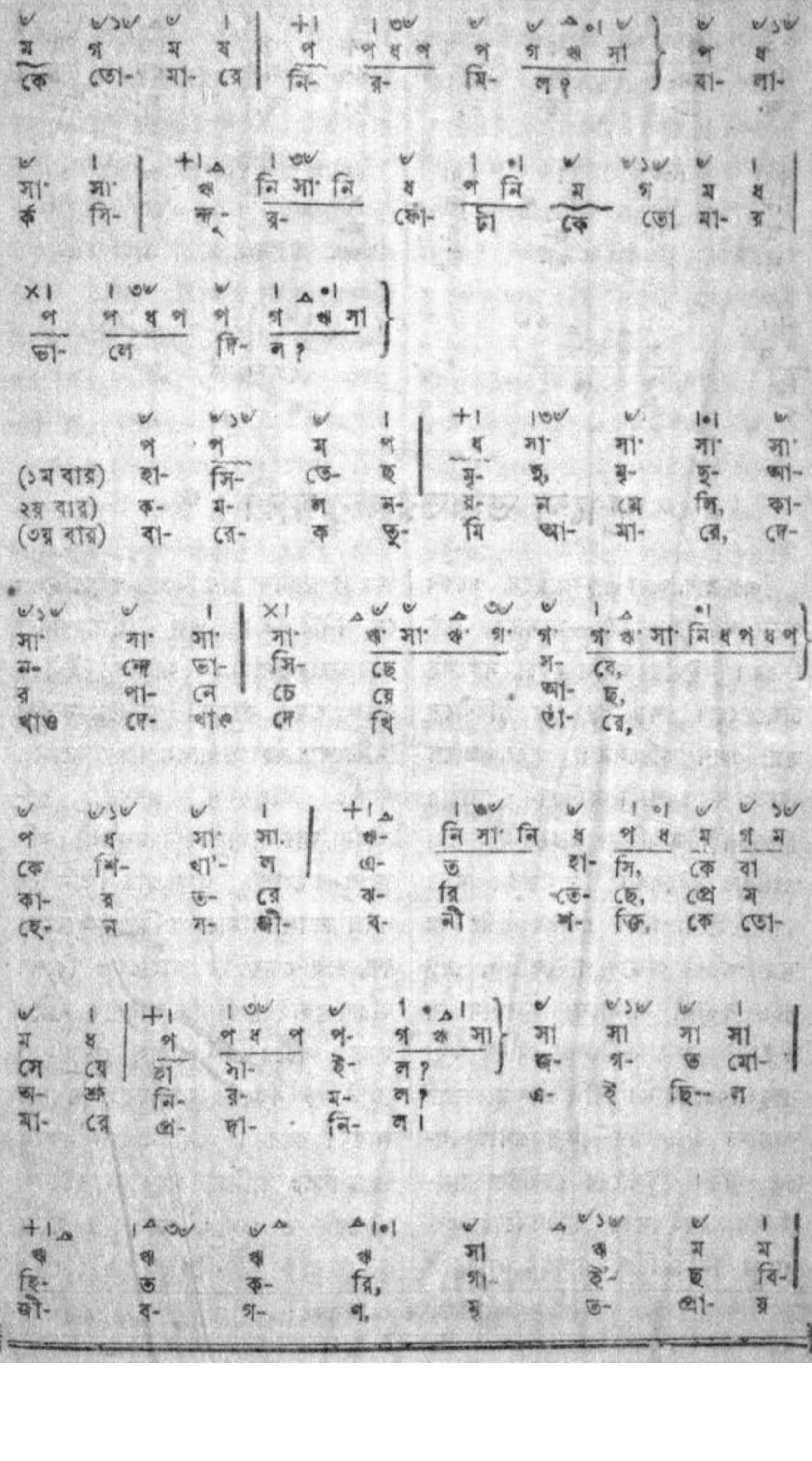
(৩৬২ সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ললিত রাগিণী—তাল আড়াঠেকা। ঐ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

৺	৶৺১৺	৺	।	‖	+।	। ৶৩৺	৺	। ০।
সা	ঋ	ম	ম	‖	ম প	ম গ ঋ	ম	প ধ প
অ-	রি	সু-	খ	‖	ম-	স্থি	উ-	ঠে!



কে তো- মা- রে নি- র- মি- ল? বা- লা-
র্ক সি- ন্ধু- র- কো- টা কে তো মা- য়
ভা- লে দি- ল?
(১ম বার) হা- সি- তে- ছ মৃ- দু মৃ- দু- আ-
২য় বার) ক- ম- ল ম- য়- ন য়ে দি, কা-
(৩য় বার) বা- রে- ক ভু- মি আ- মা- রে, দে-
ন- ন্দে ভা- সি- ছে স- রে,
র পা- নে চে য়ে আ- ছ,
খাও দে- খাও দে খি তাঁ- রে,
কে শি- খা- ল এ- ত হা- সি, কে বা
কা- র ত- রে ঝ- রি -তে- ছে, প্রে ম
হে- ন স- জী- ব- নী শ- ক্তি, কে তো-
সে যে হা সা- ই- ল?
অ- শ্রু নি- র- ম- ল? এ- ই ছি-- ল
মা- রে প্র- দা- নি- ল।
হি- ত ক- রি, গা- ই- ছ বি-
জী- ব- গ- ণ, মৃ ত- প্রা- য়

+।	। ৩৺	৺	। ০ ।	৺	৺১৺	৺	।
ম	প ধ প	ম	প ম গ	গা	গ	ঋ	সা
পি-	ছে-	কা-	য়ে;	ব-	ল	কে	সে
অ-	চে-	ত-	ন,	ভ-	ব	প-	র-

+।	।৩৺	।	৺৫।	৺	৺১৺	৺	।
নি	সা	নি ধ	নি	সা	সা	সা	সা
পু-	ণ্য-	ফ-	লি,	অ-	র্প-	ণ	ক-
শ-	ন	মা-	ত্র,	পা-	ই-	ল	ন-

+।	। ৩৺	৺	। ০ ।
ঋ	সা ঋ গ ঋ	ঋ	সা
রি-	ছ	যাঁ	সে ?
ব	শী-	ব-	ন !

ফ্রান্সে ভারতরাজকুমারী।*

এক যায়, অন্য এক আইসে, একের পতন, অন্যের অভ্যুদয়—সংসারের এই নিয়ম। ইহার অধীন হইয়া সকলেই চলিতেছে। বড় বড় বীর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন; প্রবলপ্রতাপে ধরাতল করতলশায়ী করিলেন; আবার কালের বিচিত্র গতিতে অন্যতর বীর দ্বারা পরাজিত হইলেন। বালার্কের ন্যায় যখন বোনোপার্টির গৌরব সূর্য্য অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সময় ফরাসী সাম্রাজ্যের নভোমণ্ডলে সাম্রাজ্ঞী জোজেফাইনের গৌরব সূর্য্য সম্পূর্ণ বিরাজমান। ইনি তখন য়ুরোপের অন্যান্য রাজসভার কেন্দ্রস্বরূপ উজ্জ্বলতম মণি। টুলারের রত্নখচিত রাজমন্দিরে সেই সময় ভারতবর্ষের এক অমূল্য নিধি ছিল, যাহার জ্যোতিতে অত্রত্য অন্যান্য মণি নিষ্প্রভ হইয়াছিল। সে নিধি কি? এক রূপলাবণ্যময়ী ভারত-রাজকুমারী। সাম্রাজ্ঞী ইহাকে দত্তক গ্রহণ করেন; করিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে বহুযত্নে লালন পালন করেন। একেত রাজকন্যা, রূপবতী, পূর্ণযৌবনা, তায় সাম্রাজ্ঞীর নয়নপুত্তলী; মণি কাঞ্চনের যোগ। এঅবস্থায় তিনি যে সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের কিরূপ আদরের বস্তু, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং অচিরে তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছোট বড় সকলের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলা বাহুল্য সকলে ইহাঁর বিষয় জানিতে সমুৎসুক হইবেন, হইবারই ত কথা। আমাদের মধ্যে কাহার না জানিতে কৌতূহল হইতেছে?

* প্রস্তাবির সমস্ত স্বত্ব লেখকের।

ইহাঁর সম্বন্ধে এক অতি অদ্ভুত বিবরণ প্রকটিত আছে। তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। রসিক ফরাসী জাতি কতক বিদ্রূপ ও কতক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ইহাঁকে La Sultana Indianna অর্থাৎ ভারত সুলতানা বলিয়া আপনাদিগের মধ্যে পরিচয় দিতেন এবং বাস্তবিকই প্যারী মহানগরীতে ইনি সুলতানার মত সসম্ভ্রমে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। তিনি যে ভারত-কন্যা তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে হিন্দু কি মুসলমান তাহা কিছু মাত্র নির্ণয় করা যায় না; যেহেতু যাঁহারা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণ বৈষম্য দোষে দূষিত। শুনা যায় তিনি দিলদার নামে আত্ম-পরিচয় দেন। নামে মুসলমান বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এত কালের পর সত্যে উপনীত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া ১৭৯৭ ফরাসী দেশে "La Belle Indienne, on les Aventures de la Pittie fille du Grand Mogol" এই দীর্ঘনামে এক উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কথিত আছে তাঁহার আত্মপরিচয় এই যে, তিনি এক বড় রাজার কন্যা তাঁহার পিতার যমুনা-পুলিনে মনোরম প্রাসাদ ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল, সেই স্থানের নাম কি, কিম্বা তাঁহার পিতারই বা নাম কি ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য বিষয় গুলি তাঁহার কিছু মাত্র স্মরণ ছিল না। চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক হিন্দু রাজার সহিত বিবাহের বাগদান হয়। এস্থলে পাঠক পাঠিকা দেখুন ইহাঁর নাম মুসলমান, হিন্দু রাজার সহিত বিবাহের কথা হইল আর যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, এইটীর কোনওটি ধরিয়া বিচার করিলে কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। তাহার কারণ এই—অদ্যাবধি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এক মুসলমান শাসনাধীন হইয়া বাস নিবন্ধন আচার ব্যবহারে এমন কি নামের কতকটা মিল দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য শুধু নাম ধরিয়া ইহাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। আর যে সময়ের কথা, তখন হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষতঃ রাজা ও রেইস্‌দিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইনি মুসলমান কন্যা হইয়া হিন্দু স্বামী গ্রহণ করিতেও পারেন এবং হিন্দু কন্যা হইয়া মুসলমান স্বামীর সহিত ও পরিণীত হইতে পারেন। দুইই সম্ভব। যে যাহাহউক প্রাচ্য দেশোচিত সমারোহে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বিবাহ দিন উপস্থিত। কন্যা স্বর্ণবস্ত্র পরিহিতা ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে এত ভারাক্রান্ত হইলেন যে অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত এক পদও তিনি সঞ্চরণ করিতে পারেন না। কিন্তু কেহ কি সপ্নেও জানিয়াছিল যে, সিন্দুরবিন্দু-শোভিত বলি-প্রস্তুত ছাগের ন্যায় তাঁহাকে অবি-

লগ্নে প্রজাপতির সকাশে হৃদয়ের মত বৈবাহিক সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইবে? বাদ্যকর ও পতাকাবাহীতে তরণী পরিপূর্ণ। এক একখানি করিয়া শত শত তরণী বিবাহ বাটীর নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। একে যমুনা তটস্থ অট্টালিকা, তায় সন্ধ্যাকাল; প্রকৃতি এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। শোভন দৃশ্যে সকলের প্রাণ বিমোহিত। স্তন্যসুবাসিতা পাপে অকলঙ্কিতা মুর্ত্তিমতী সরলতা কি স্থির থাকিতে পারে? যৌবন-সুলভ লজ্জাশীলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, বিবাহ যে কি বস্তু তাহা কি তিনি তখন বুঝিয়াছেন? স্বামী স্ত্রীতে যে কি সম্বন্ধ তাহা তিনি কি তখন বুঝিয়াছেন? বুঝিলে লজ্জায় অধোমুখী হইতেন, অবরোধে রুদ্ধ থাকিতেন। কিন্তু তাহা ত নহে। অন্যান্য নর নারী যেরূপ আনন্দিত, তিনিও তদ্রূপ। আপনার বিবাহ দেখিতে—আপনার বরের আগমন-শোভা দেখিতে দেখিতে—আহ্লাদে আটখানা। তাড়াতাড়ি উত্তমরূপে দেখিবার জন্য সহচরীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছাদের এক প্রান্তভাগে আরোহণ করেন। হায়! বিধাতার বিড়ম্বনা! স্রোতস্বিনীতে পড়িয়া গেলেন। টানে বহুদূরে ভাসিয়া গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না। সকলে আমোদে মত্ত, সকলে জানে মেয়ে কোনও না কোনও স্থানে খেলায় মাতিয়া আছে; আর ভাবনাই বা কি, ভাবনারও কোনও কারণ নাই, যেহেতু সঙ্গে লোক আছে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

(উপন্যাস।)

কোন এক নগরে একদা জনৈক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তিনি এক বৃক্ষতলে অগ্নিকুণ্ড করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ঈশ্বরপরায়ণ পরম ভক্ত সাধু। তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার নাম শুনিয়া নগরবাসী বহু নরনারী তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এক দিন নগরের এক প্রসিদ্ধ ধনী বণিকপত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন—তাঁহার নাম লক্ষ্মী। পিতৃগৃহে শৈশবকালে তিনি এই নামে পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে চঞ্চলা বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও তাঁহাকে শেষোক্ত নামেই অভিহিত করিব। চঞ্চলা সুন্দরী নহেন, তাঁহার বর্ণ কাল, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, নাসিকা চেপ্টা, হস্ত পদাদির গঠনও প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু

প্রাকৃতিক অভাব দূর করিবার জন্যই হউক কিংবা ধনী লোকের গৃহিণী বলিয়াই হউক চঞ্চলার বেশভূষার প্রতি বেশ দৃষ্টি ছিল। তাই সাধুদর্শনে আসিবার কালেও বেশভূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার শরীর আপাদমস্তক রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছিল। পরিধানে একখানি বহুমূল্য শাড়ী। চঞ্চলার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। তৎপরে চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা। এখানে কি চাই?"

চ—"আপনার শ্রীচরণ দেখবার জন্য এসেছি।

স—"সাধু দর্শনে এসেছ, তাতে আবার এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কেন?

চঞ্চলা একটু লজ্জিতা হইলেন এবং কিয়ৎকাল নিঃশব্দে অধোবদনে রহিলেন।

স—মা, কিছু মনে কর না, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, যা মনে উঠে তাই বলে ফেলি। ইচ্ছা হয়ত বস।

সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া চঞ্চলা সমীপবর্ত্তী এক আসনে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী আরও দুই এক ব্যক্তির সহিত কিয়ৎকাল বাক্যালাপ করিয়া চঞ্চলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "মা! শ্রীচরণ দেখা হ'লত, এখন ইচ্ছা হ'লে যেতে পার।"

চ—"বাবা! আপনার নিকট কিছু ধর্ম্মোপদেশ চাই।"

স—তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম হচ্চে বেশভূষা করা। ঐ প্রবৃত্তিটা একটু থামলে ধর্ম্মের খবরটা নিলেই ভাল হয়।

চ—বাবা, আমরা সংসারী মানুষ, পাপেই আমাদের মতি, তাইতে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শনে এসে থাকি, আপনারাও যদি পাপীজন ব'লে তাড়িয়ে দেন তা'হলে যাই কোথা?

স—আমরা পাপী ব'লে তাড়াই না, তবে কিনা ভরা কলসীতে বায়ু পুরা যায় না। বিষয়াসক্তিতে পূর্ণ তোমার হৃদয়ে আমি ধর্ম্মের বায়ু কি করে প্রবেশ করাব?

চ—বাবা, আপনাদের অসাধ্য আবার কি আছে? আপনারা, কৃপা করেইত অনেক পাপী তরে যায়।

সন্ন্যাসী দেখিলেন চঞ্চলা সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। তৎপরে বলিলেন "মা, একটু অপেক্ষা কর। সন্ন্যাসী নিরস্ত হইবার প্রায় পনর মিনিট পরে তথায় অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন বস্ত্র পরিধানকারী দুইজন ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি সন্ন্যাসী মানুষ এখানে কি চাই?

ভিক্ষুক—বাবা, কিছু খাবার চাই, অনাহারে আর প্রাণ বাঁচে না।

কাতরোক্তি শুনিয়া সন্ন্যাসীর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। তৎপর বলিলেন বাবা বস, দেখি ভগবান্ তোমা-

দের জন্য কিছু দেন কিনা। সন্ন্যাসীর আশ্বাস বাণী শুনিয়া ভিক্ষুকদ্বয় নিকটে উপবেশন করিল। সন্ন্যাসী চঞ্চলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন মা, তুমি ধর্ম্মোপদেশ চাহিয়াছ। "পুণ্যক পরোপকারে পাপক পরপীড়নং।" এইত ধর্ম্মের সার কথা। এখন পরোপকারের কাল উপস্থিত। সম্মুখে এই ভিখারীদ্বয়কে দেখিতেছ। অন্নাভাবে ইহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন এবং ছিন্ন। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাতে বিচার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে পারি যে ইঁহারা দানের উপযুক্ত পাত্র। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্। ব্যাধিতস্যৌষধম্ পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" হে কৌন্তেয়! দরিদ্রদিগকে ভরণ কর, ধনীদিগকে ধন দান করিও না। রোগীরই ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন, নীরোগীর প্রয়োজন নাই। তাই মা আমি অনুরোধ করি যে তোমার কানের দুল দুটী এই দুঃখীদ্বয়কে দাও। ইহারা অনাহারজনিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পা'ক।

সন্ন্যাসীর সমক্ষে যে এইরূপ কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন, চঞ্চলা এইরূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি এখন কি করেন, কাণের দুল দুইটী এক কথাতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন তাঁহার মনের বল এতটুকু হয় নাই। অথচ সন্ন্যাসী ঠাকুর উহা দাবি করিতেছেন। তিনি চিন্তা করিয়া একটি উত্তর ঠিক্ করিলেন। উত্তরটি সত্যমূলক হইলেও চঞ্চলা তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিলেন। তিনি বলিলেন ঠাকুর! আমার বাবা আদর করে এই দুল দুইটী আমাকে দিয়েছেন, ইহা আমার বাবার চিহ্ন। আমি আর কোন গহনা দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটী দুল দিতে পারি না।

স—মা তোমার হাতের বালা দু গাছি কে দিয়েছেন?

চ—তা ও বাবা দিয়েছেন।

স—তবে তাই কেন বাবার চিহ্ন হ'ক না?

চঞ্চলা যে এইরূপ পরীক্ষায় পড়িবেন তাহা ভাবিতে পারেন নাই। এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চ—আমি এই দুল দুইটির পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য ক'র্লে কি আপনি সুখী হন না?

স—মা সন্ন্যাসীগণ এক রোকের লোক। তুমি লাখ টাকা দিবে বল্লেও আমি আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না। আমি বুঝেছি তোমার দুল দুইটীতে আসক্তি রয়েছে। তুমি যখন ধর্ম্মার্থিনী হ'য়ে এসেছ, তখন আমি তোমার আসক্তির জিনিষই সর্ব্বাগ্রে কাড়িয়া লব। তুমি দুল দুইটি দিবে কি না বল?

চ—(করযোড়ে) বাবা আমায় মাপ কর, আর কিছু দি, আপনি খুসী হউন।

স—অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে চঞ্চলার অন্তরে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতে লাগিল। চঞ্চলা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ফুল দেওয়াই স্থির করিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, এই ফুল দুটী নিন। আমি এ পর্য্যন্ত আমার ভোগ-বাসনার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলাম, কিন্তু বাবা এখন দেখতে পেলেম সৎ-পাত্রে দান জন্য ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দেওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত। তাই আপনার আদেশ পালনে যত্নবতী হইয়াছি। সন্ন্যাসী দেখিলেন ফুলের প্রতি চঞ্চলার যে অনুরাগ ছিল, তাহার অবসান হই-য়াছে। এই অনুরাগের বিনাশ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে দেখিয়া তিনি আর ফুল গ্রহণ করিলেন না। তিনি এক শিষ্যের প্রতি আদেশ করিয়া বলিলেন "আমার ঝুলনা হইতে গত কল্য-কার প্রাপ্ত টাকা কয়টী আনিয়া ভিখারী-দিগকে দাও। শিষ্য প্রভুর আজ্ঞাক্রমে টাকা কয়টি লইয়া ভিক্ষুকদ্বয়কে প্রদান করিল। চঞ্চলা সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল। চঞ্চলা সে দিন ত্যাগের যে দীক্ষা প্রাপ্ত হইল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার দত্ত ফুল দুটী গ্রহণ করি-লেন না সত্য, কিন্তু চঞ্চলা গৃহে প্রত্যা-গমন করিয়া কেবল ফুল কেন, সমস্ত গহনা এক বাক্সে বদ্ধ করিয়া স্বর্ণকারের নিকট প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণকারের নিকট সমস্ত ভূষণ বিক্রয় করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এক কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আপ-নার নাম ধাম সমস্তই গোপন করিলেন। ইহারই নাম প্রকৃত দান, ইহারই নাম প্রকৃত বৈরাগ্য। দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নরনারীগণ যে ভোগবাসনায় বিসর্জ্জন দেন, তাহাকেই প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায়। এজন্য সাধু বলিয়াছেন "স্বার্থ-নাশজ বৈরাগ্যং।" যাঁহারা কৃপণতা-বশতঃ কিম্বা নাম ক্রয় করিবার জন্য ভোগস্পৃহাকে দূরে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না। আশা করি বেশভূষা-প্রিয় বঙ্গ-ললনাগণ এই আখ্যায়িকাটীর সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জীবন তদনুসারে নিয়মিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

যাহাহউক ভগবৎপ্রসাদে, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দিগের সদাশয়তায়, এবং রেলওয়ে গাড়ীর কল্যাণে এখন আমি পচম্বায়। পচম্বা ছোটনাগপুর

বিভাগে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গিরিদি ষ্টেশন হইতে পচম্বা প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমার কোনও ভক্তিভাজন আত্মীয়ের নিকটে শুনিয়াছি, এখানে পাঁচটী প্রকাণ্ড আমের গাছ থাকায় এই স্থানের নাম পচম্বা (পঞ্চাম্র) হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া পচম্বার জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থের সখা-সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন পচম্বায় আসিয়া ইহার অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে আমরা এখানে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দুই একটী সামান্য বিষয় হইতে ইহা সকলের বোধগম্য হইবে। প্রমদা বাবু এখানে আসিয়া লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, ব্যতীত অন্য তরকারী দেখেন নাই, কিন্তু আমরা এখানে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, বেগুন আলু, সিম, বরবটী, মটর, কপি, ওল, কচু এবং আমাদের দেশীয় শাক সব্জী যথাক্রমে পাইতেছি। তবে এখানকার কচু আমাদের দেশের "মানকচু" জাতীয় নহে, "শোলা কচু" জাতীয়। প্রমদা বাবুর আসার সময়ে দুগ্ধ ঘৃত নাকি অতিশয় সুলভ ছিল, এখন কিছু মহার্ঘ হইয়াছে। যাহাহউক কলিকাতার তুলনায় এখানকার দুগ্ধ, ঘৃত, তরকারী, ফল প্রভৃতি যেমন সুখাদ্য, সেই রকম সুলভ।

এতো গেল পচম্বার সাধারণ অবস্থা। পচম্বার বিশেষত্ব এই যে পচম্বা প্রকৃতি দেবীর ক্রীড়া কানন। শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে পচম্বায় মানবের বসতি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও আছে কি না আমার মনে বড়ই সন্দেহ হয়! পচম্বার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হয় যে, আমাদের বঙ্গদেশে (সহরের কোলাহলে, পল্লিগ্রামের ম্যালেরিয়ায়) প্রকৃতি-দেবী মনের সাধে সরলা বালিকার মত খেলিয়া বেড়াইতে পারে না—আমাদের বঙ্গভূমি—"সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শ্যামাসুন্দরী" দুঃখদারিদ্রতাপূর্ণ অঁাচলে প্রকৃতি জননীকে বসাইয়া মনের মত সোহাগ করিতে পারেন না, তাই মা বাছিয়া বাছিয়া এই শ্যামল নির্জ্জনে তাঁহার ক্রীড়াকানন স্থাপন করিয়াছেন। তাই নদীনির্ঝর-নিনাদিত, বিহঙ্গ-কূজিত, পাহাড় প্রাচীর বেষ্টিত, শ্যামকান্ত বিজনে মা প্রাণ ভরিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন। তাই পচম্বার বুকে এত শোভা, তাই পচম্বার শোভা এত মনোমোহিনী। এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ছবি অঁাকিয়া দেখাইতে পারি, সে শক্তি আমার কখনই নাই, তবে যথাসাধ্য পাঠিকা ভগিনীকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এখানে আসিয়াই আমরা বিশ্রাম শিলা" এবং তাহার নিকটস্থ ঝরণা দেখিতে গিয়াছিলাম। যিনি আমার এই বিদেশ ভ্রমণের এক প্রধান সহায়, আমার

সে পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয় অস্বুস্থতার জন্য সেদিন আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। এমন আনন্দের সময়ে তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে আমার মনটা একটু কেমন কেমন করিতে লাগিল। যাহাহউক আমরা বাড়ী ছাড়িয়া, রাস্তার উপরে উঠিয়াই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। কার্ত্তিক মাস, তথাপি দক্ষিণ দিকের আকাশের গায়ে স্তবকে স্তবকে মেঘ সকল—গাঢ় নীল রঙের মেঘ সকল সাজান রহিয়াছে! বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে সে দৃশ্য দেখিতে গিয়া শুনিলাম উহা সত্য সত্য নীল মেঘ নহে, উহা পরেশনাথ পাহাড়শ্রেণী! সেই মেঘমালা সদৃশ পাহাড় শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ চূড়াবৎ পরেশনাথের মন্দিরটী একখানি ছবির মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অভিভাবক মহাশয় তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। ইহার পরেও আমরা পুনঃ পুনঃ সেই পরেশনাথ পাহাড়ের ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু চাঁদের আলো দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি জন্মে না, শিশুর হাসি দেখিয়া যেমন পরিতৃপ্তি জন্মে না, সেই রকম দূর হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়াও আমার একটুকুও পরিতৃপ্তি জন্মে নাই! সে শোভা চিরদিনই নূতন! সূর্য্যাস্ত সময়ে সেই নীল ছটার উপরে রক্তিমবর্ণ, সোণালিবর্ণ, ফিঁকে গোলাপীবর্ণ মেঘমালা যখন খেলা করিয়াছে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, প্রভৃতি তিথিতে নবোদিত চন্দ্রমা যখন পশ্চাদ্বর্ত্তিনী তারাটী লইয়া হীরক মুকুটের নীচে দোদুল্যমান গজমুক্তার মত বাহার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা নীরব নিস্পন্দ হইয়াই প্রকৃতির সেই মনোমোহিনী ছটা দেখিয়াছি! আর সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য মনে মনে পাগল হইয়া গিয়াছি! সে সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝাইবার জিনিস নহে।

যাহাহউক আমরা ক্রমশঃ বিশ্রামশিলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পাঠিকা ভগিনী জানেন যে রেলওয়ের গাড়ীতে আমার জ্বর হইয়াছিল। তাই বিশ্রাম-শিলা দেখিবার দিনে, অভিভাবক মহাশয়ের আদেশে, বাধ্য হইয়া খানিক দূর আমাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। এ রকম স্থানে গাড়ীতে বসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা, আমার বিবেচনায় নিতান্তই "পোড়া কপালের ভোগ।" সেই জন্য আমার স্বাস্থ্যকে আমি মনে মনে বিলক্ষণ "দশ কথা" শুনাইতে লাগিলাম। তা' সৌভাগ্যক্রমে এই পোড়া কপালের ভোগ আমাকে অধিকক্ষণ ভুগিতে হইল না, খানিক দূরে গিয়া আমার স্নেহময় অভিভাবক মহাশয়, আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে অনুমতি করেন। আমার বড়ই আনন্দ হইল—আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি বাঁচিলাম (!)। তখন সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলপূর্ণ, গৈরিক মৃত্তিকার মাঠ দিয়া, মাঝে আম ও দোয়া কুলের গাছ সকল দেখিতে দেখিতে,

পথে কাঁকরে ও সাদা কালো প্রভৃতি নানা বর্ণের উপলখণ্ডে "মৃদুমধুর" হোঁচট খাইতে খাইতে, আমরা বিশ্রামশিলার মাঠে উপস্থিত হইলাম। এই মাঠে প্রথমেই ব্যাঘ্র মুখাকৃতি, নরমুণ্ডাকৃতি ও কচ্ছপ পৃষ্ঠাকৃতি অনতিবৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ সকল রহিয়াছে; তার পরেই বিশ্রামশিলা। বিশ্রামশিলা এক একটী অনতিবৃহৎ পাথরের বিছানা; এমন বিছানা, কত দূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্বর্গীয় প্রমদা বাবুই নাকি এই অপূর্ব্ব প্রস্তর শয্যাকে "বিশ্রাম শিলা" নাম দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষন পথে আমাদিগের যে টুকু শ্রান্তি হইয়াছিল, বিশ্রাম শিলার মাঠে আসিয়াই তাহা দূর হইল। আমার বোধ হইল আমি যেন কোমল মকমলের উপর দিয়া চলিতেছি; ব্যগ্র হইয়া পদ-প্রান্তে চাহিয়া দেখিলাম, এখানে এক জাতীয় পার্ব্বত্য শৈবাল জন্মিয়াছে; মকমলের উপর দিয়া চলিতে লাগিলে মানব যেমন আরাম লাভ করে, এই পার্ব্বত্য শৈবালের উপরে পাদুকাবিহীন পদে চলিতে লাগিলেও সেই রকম আরাম পাওয়া যায়! প্রমদা বাবু অল্প-বয়স্ক হইলেও একজন ভগবৎভক্ত সাধু ছিলেন। তাই তিনি এ সুখশয্যার নাম "বিশ্রাম শিলা" রাখিয়া গিয়াছেন! এ বিশ্রাম শিলা, সত্য সত্যই বিশ্রামশিলা। সত্য সত্যই মা' বিশ্ব জননী তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানদিগের আরামের জন্ম স্বহস্তে এই প্রস্তর শয্যা রচনা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমার প্রাণ কৃতকৃতার্থ হইল! হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমার সঙ্গী বালকেরা কেহ বিশ্রাম-শিলার উপরে শুইয়া পড়িল, কেহ উল্‌টা বাজী খেলিবার মত গড়াগড়ি দিতে লাগিল; আমারও বড় সাধ হইল, মা'র স্বহস্ত রচিত এমন সুখশয্যায়, এই স্নিগ্ধ "পশ্চিমে বাতাস" রূপ অকল সঞ্চালনে, অদূরবর্ত্তী নির্ঝর স্রোতের মধুমাখা গীত শুনিতে শুনিতে, দিগন্তপ্রসারিত নীল আকাশের তলে শয়ন করিয়া, একবার প্রাণের প্রাণে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকারিণীকে গাঁথিয়া ফেলি! সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিতে না পারিলে এ সুন্দর জগতে কিছুতেই পরিতৃপ্তি নাই!

বিশ্রাম-শিলার অনতিদূরে শালবন। শালবন দেখিতে যাইবার সময়ে আমরা চারিদিকের শস্যক্ষেত্রগুলিও দেখিলাম। যিনি বঙ্গভূমির হরিৎবর্ণ ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তিনি যে এ দেশের শস্যক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবেন, আমি এমন ভরসা করি না। এখানে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র যাহা দেখিলাম, তাহা বঙ্গীয় পল্লিগ্রামের তুলনায় অল্প। যাহাহউক মাঝে মাঝে এক একখানি শরগুজার ক্ষেত্র * দেখিয়া আমার মনে হইল প্রকৃতি দেবী তাঁহার সবুজ বারা-ণসী শাড়ীর সোণার আঁচলটী এইখানে

* শরগুজা এক প্রকার শস্য। ইহা হইতে পশ্চিমবাসীরা তৈল প্রস্তুত করে। এ তৈল কতকটা সরিষা তৈলের মত।

বিছাইয়া দিয়াছেন! সোণালী রঙের ফুল সকল ফুটিয়া ক্ষেত্র যেন আলো করিয়াছে। আমার পল্লিগ্রামবাসিনী ভগিনী যদি সরিষার ও শণের ফুল-ভরা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া থাকেন, তবে পশ্চিমের সোরগুজা ফুলের ক্ষেত্র-শোভাও তিনি অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

শালবনে প্রবেশ করিবার সময়ে আমার মনে বিলক্ষণ একটু "সৌভাগ্য-গর্ব্ব" উপস্থিত হইল। কারণ ইতিপূর্ব্বে দেশে আমি শালের কড়িকাঠ, শালের খাট, তক্তাপোষ, শালের বাক্স প্রভৃতির সহিত বিশেষ পরিচিতা ছিলাম। অধিক কি, দেশে শালকাঠের প্রতিপত্তি দেখিয়া মানবজগতের গ্লাডষ্টোনের মত, বৃক্ষজগতে শালবৃক্ষের একটা যে ভারী বিশেষত্ব আছে, এ বিষয়ে আমি সন্দেহ-শূন্যা। তাই এত দিনে শালবন দেখিতে পাইয়া আমি আমার সৌভাগ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। এ বনের বৃহৎ বৃক্ষ সকল লোকে প্রয়োজনার্থ কাটিয়া ফেলিয়াছে; এখন অনতিবৃহৎ, নধর, সরল শালতরু সকল স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শালবনে প্রবেশ করিয়াই নির্ঝরের অস্ফুট শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আর একটু অগ্রসর হই[illegible] নির্ঝরের অপূর্ব্ব কান্তি দেখিতে পা[illegible]লাম! সেখানে দেখি যে, দুর্ভে[illegible] প্রস্তররাশি ভেদ করিয়া "সোঁ সোঁ [illegible] সোঁ" রবে প্রবহমান জলরাশি ব[illegible] যাইতেছে! সে যেন দ্রবীভূত হী[illegible] স্রোত ছুটিয়াছে! সে যেন মান[illegible] শ্রুতির অবোধ্য স্বর্গীয় গীতি গাহি[illegible] গাহিতে দিগ্‌দিগন্তে চলিয়াছে! আম[illegible] সেই পবিত্র অমৃতময় জল লইয়া মু[illegible] চোখে দিলাম; সে জলের স্নিগ্ধতা [illegible] আমাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করি[illegible] অন্তরাত্মাকেও স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করি[illegible] সেই সময়ে একটী বালকণ্ঠ-নিঃসৃত ভগ[illegible] দ্বিষয়ক অমৃতমাখা গীতি শুনিতে শুনি[illegible] আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল[illegible] আমার ইচ্ছা হইল আমি একবার প্র[illegible] খুলিয়া ডাকিয়া বলি "মা! বিশ্বজননি[illegible] তুমি আমার সুখের জন্য এত খাটু[illegible] খাটিলে, আমি তোমার জন্য কি কা[illegible]লাম? এ অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন অ[illegible] সন্তানের জন্য এতটা খাটুনি কেন তু[illegible] খাটিলে মা?"

ইহার পরে আমরা বাড়ীতে ফিরিলা[illegible]

(ক্রমশঃ)

পুণ্ডরীক কাহিনী।

পণ্ডর পুরেতে বাস দ্বিজ একজন,
পুত্র আশে ভার্য্যা সনে পূজে নারায়ণ;
কত দিন পরে তবে প্রসাদে ধাতার,
জন্মিল সুন্দর পুত্র, উজলি আগার।

পিতা মাতা দিলা তারে "পুণ্ডরীক" না[illegible]
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, পূর্ণ মনস্কাম।
পুণ্ডরীক, মা বাপের নয়নের তারা,
পলকে প্রলয় জ্ঞান, হ'লে আঁখি-হারা

এইরূপে শিশুকাল, বাল্যকাল গেল,
তরুণ যৌবন তবে যথাকালে এল ;
মধুমাসে তরু যথা নবীন নধর,
তেমনি বরাঙ্গ তার হইল সুন্দর !
উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি, উঠিল জাগিয়া,
সুখের পিপাসা দিল প্রাণ মাতাইয়া,
তাই হায় ! ধর্ম্মজ্ঞান করি বিসর্জ্জন,
পাপাচারে পুণ্ডরীক ঢেলে দিল মন !
ত্যজিল সে পবিত্রতা, মা'-বাপে ভকতি,
পাপে বুদ্ধি, পাপী সঙ্গী, পাপ কাজে মতি,
নাহি শোনে মাতা পিতা শিক্ষা দেন যত,
সে অবাধ্য অবিনীত কদাচারে রত !
এক দিন ভাসি মাতা নয়নের জলে,
ধরিয়া পুত্রের করে স্নেহভাবে বলে,
"তুই বাপ পুণ্ডরীক ! অঞ্চলের ধন,
এ দশা দেখিয়া তোর, বিদরিছে মন !
আমার মাথার কিরে, দিব্য দেবতার,
আজি হ'তে পাপ কাজ করিওনা আর।"
অমৃত ঔষধ যাহা, এ মর ধরায়,
মৃত্যুকালে রোগী তাহা ভয়ে নাহি খায়,
তেমনি মায়ের সেই পীযূষ বচন,
না শুনিল পুণ্ডরীক নাহি দিল মন ;
দুঃখিত অন্তরে পিতা কত গালি দিল,
তথাপি সে কোন মতে পাপ না ছাড়িল।
বিষম কুবাক্যে আর রুক্ষ ব্যবহারে,
মা বাপের ব্যথা দিল অশেষ প্রকারে ;
তুচ্ছ সুখ তরে হায় ! অমূল্য জীবন,
করিল এমনি ক'রে পাপে নিমগন ;
মা বাপের প্রাণে দিয়া দারুণ বেদনা,
না হইল অভাগার একটু চেতনা।
একদিন পুণ্য যোগে আনন্দিত মনে,
চলিল অনেক লোক কাশী দরশনে ;
পিতা মাতা সনে আর প্রতিবাসিগণ,
পুণ্ডরীক কাশী পথে করিল গমন।
কত দূরে যেতে যেতে আসিল রজনী,
আঁধার বসনে মুখ ঢাকিল ধরণী ;
সম্মুখে দেখিয়া এক সাধুর ভবন,
তাহারি নিকটে সবে করিল শয়ন ;
একে একে সকলেই পড়িল ঘুমিয়া,
শুধু একা পুণ্ডরীক রহিল জাগিয়া ;
নিদ্রা নাহি আসে তার তাই আন মনে,
নিরখিছে চারিদিকে চকিত নয়নে।
হেন কালে কৃষ্ণবর্ণা তিনটী যুবতী,
জলের কলস শিরে মৃদু মৃদু গতি ;
সাধুর আশ্রমে তারা করিল গমন,
নিরখিয়া পুণ্ডরীক সকৌতুক-মন,
কত ক্ষণে বামাগণে আসিল ফিরিয়া ;
অপূর্ব্ব জ্যোছনাময়ী মুরতি ধরিয়া ;
পবিত্র রূপের ছটা উঠেছে উথলি,
দেখিলেই মনে হয় দেববালাবলি !
হেরিয়া বিস্ময় মনে পুণ্ডরীক উঠি,
প্রণাম করিল গিয়া ভূমিতলে লুটি ;
যুড়িয়া যুগল কর ভক্তিভাবে কয়,
"কা'রা মা ! তোমরা, দাসে দেহ পরিচয়?"
হাসি মুখে উত্তরিলা সে তিন যুবতী,
"আমরা যমুনা, গঙ্গা, আর সরস্বতী।"
শুনি পুণ্ডরীক পুন করে নিবেদন,
"এত রাত্রে এখানে মা, কিবা প্রয়োজন?
দেখিনু যখন সবে আশ্রমে চলিলে,
তামসী নিশার মত কৃষ্ণবর্ণা ছিলে,
এবে যে রজত-শুভ্র, বরাঙ্গ-বরণ,
জানিতে বাসনা মম ইহার কারণ।"

দেবীগণ বলে "এই সাধু সদাশয়,
পিতা-মাতা-পদ সেবে সকল সময়।
আমাদের জলে গিয়া স্নান দান করে,
না পায় সে অবসর, একক্ষণ তরে ;
তাই মোরা নিজে আসি এ দেব-আশ্রমে,
পয়াণ পবিত্র হয় সাধু-সমাগমে।
লক্ষ লক্ষ মহাপাপী স্নান করি যায়,
তাই মোরা সারা দিন থাকি কৃষ্ণকায় ;
কিন্তু পিতা-মাতা-ভক্ত এই সাধু জন,
এঁর পুণ্য অঙ্গ যবে করি পরশন,
পুন আমাদের দেহে দেব-জ্যোতিঃ আসে,
বলিনু সকল কথা তোমার সকাশে।
তুমি যদি পুণ্ডরীক ! চাহ দিব্য গতি,
জনক-জননী-পদে রাখিও ভকতি ;
মাতা পিতা পূর্ণ ব্রহ্ম এ মর ধরায়,
সে পদ পূজিলে নরে শুভ গতি পায় !"
এত বলি দেবীগণ হৈল অন্তর্দ্ধান,
কথা শুনি চমকিল পুণ্ডরীক-প্রাণ !
পিতৃ-মাতৃ-দ্রোহী সেই ব্রাহ্মণ-কুমার,
দেবীগণ বাক্যে হিয়া গলিল তাহার !
ঘুমন্ত মানব যেন উঠিল জাগিয়া,
অনুতাপে অশ্রু পড়ে কপোলে বহিয়া ;
মনে মনে পুণ্ডরীক ভাবে সেই ক্ষণ,
"সর্ব্ব পুণ্যতীর্থ পিতা মাতার চরণ !
অধম পামর আমি মহাপাপে রত,
মা' বাপের বুকে সদা ব্যথা দেই কত !
জনমিনু পুণ্য কুলে আমি কুলাঙ্গার,
কি উপায় হবে হায় ! এই অভাগার ! !
আজি হ'তে পাপ কাজ সমূলে ছাড়িব,
মা'-বাপ-সেবার তরে জীবন সঁপিব।
পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত সুতে করিয়া করুণা,
ঘরে আসে সরস্বতী জাহ্নবী যমুনা—
দেবীরা পবিত্র হয় সে নরে পরশি,
মাথায় করিয়া বহে জলের কলসি !
ইহার অধিক ফল কিসে কেবা পায় ?
কি তুচ্ছ পুণ্যের লোভে অন্য তীর্থে যায় ?
ইহা ভাবি মা বাপেরে সঙ্গেতে লইয়া,
পুণ্ডরীক নিজ বাসে আসিল ফিরিয়া।
তদবধি পাপ কাজ সকলি ছাড়িল,
মাতা-পিতা-সেবা তরে জীবন সঁপিল।
সে চরণ সেবা বিনা অন্য নাহি মনে,
মা' বাপেই পুণ্ডরীক দেখে নারায়ণে।
এইরূপে কিছু দিন হ'ল অবসান,
সাধনা হেরিয়া তার, তুষ্ট ভগবান ;
ভকতের ভকতির পরীক্ষার তরে,
আসিলা করুণাময় পুণ্ডরীক-ঘরে।
ভক্তিমান্ পুণ্ডরীকে দেখিলা শ্রীহরি,
পিতা-মাতা-পদ সেবে আপনা পাসরি ;
হরি-আগমনে গৃহ পূরিত গৌরবে—
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি, অমৃত সৌরভে !
সবিস্ময়ে পুণ্ডরীক ফিরি চাহে পাশে,
দেখিল ত্রিদিব ছটা, গৃহমাঝে ভাসে !
চাহিয়া চিনিল প্রভু সাধক বৎসলে,
ভরিল যুগল আঁখি প্রেম-অশ্রু জলে !
কিন্তু পিতা-মাতা-সেবা তবু না ছাড়িল,
হাত বাড়াইয়া এক ইষ্টক আনিল ;
বিশ্বনাথে দিয়া সেই ইষ্টক-আসন,
পুনঃ মাতা পিতা সেবে হ'য়ে একমন।
রেখে সে ইটের প'রে চরণ কমল,
রহিলেন দাঁড়াইয়া ভকত-বৎসল !
বহুক্ষণে পুণ্ডরীক সেবা সমাপিল,
তবে ভগবান্-পদে প্রণাম করিল !

হরি সে ভকতি, সেবা, প্রীত হয়ে অতি,
বর লহ পুণ্ডরীক" বলে বিশ্বপতি।
পুণ্ডরীক বলে "প্রভো, কি চাহিব আর,
অমনি দাঁড়িয়ে থাক, সম্মুখে আমার।
সদা পিতা-মাতা-সেবা করিতে করিতে,
রাঙ্গা চরণ যেন পাই নিরখিতে।"

ভকত-অধীন হরি ভকত-পরাণ,
"তথাস্তু" বলিয়া দিলা সেই বরদান।
সিদ্ধ হৈল পুণ্ডরীক মহাসাধনায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে সদা দেখা পায়।
যেখানে সে পুণ্যবান্ হ'ল সিদ্ধকাম,
এ ভারতে সে নগর "পুণ্য-ক্ষেত্র" নাম।

শ্রীমা।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের রাজভবনে গত ২৫এ চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অনারেবল রমেশ চন্দ্র দত্ত সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোককে মোহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই সভা চিরজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে সমর্থ হউন।

২। ভূতপূর্ব্ব সামরিক সেক্রেটারী সার জর্জ চেসনী ৬৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ গতায়ু হইয়াছেন।

৩। কলুটোলার বাবু গোপাললাল শীল শিবপুর ভড়পাড়া খালের পুলের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

৪। চিত্রলের উমার খাঁর সহিত গবর্ণমেন্টের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইতিমধ্যে ইংরাজ পক্ষে ৭০ জন, বিপক্ষদিগের৫০০লোক হত হইয়াছে শুনা যায়।

৫। কাবুলের আমীরের মধ্যম পুত্র নজরুল্লা খাঁ এই মাসেই বিলাত যাত্রা করিতেছেন।

৬। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের মধ্যে ৮০০ লোকের না কি প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অকলঙ্ক রাজত্বের এ বড় কলঙ্ক। মহারাণী কি করিবেন, আইনের বাধ্য!!

৭। জাপানের যে যুবক চিন রাজদূত লিহংচেকে গুলি করিয়াছিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৮। জাপানীরা দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় ফর্ম্মোসা দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন।

বামারচনা।

বসন্তে শৈশবস্মৃতি।

১

মূর্ত্তিমান সুবসন্ত বিরাজিত তথা,
প্রাণ পুলকিত হয় ভাবিয়া সে কথা।
আমার আনন্দ ধাম,
ছোট খাট পল্লীগ্রাম
নগরের হাব ভাব বিলাস সভ্যতা ;

২

নগরের কোটা বাড়ী গাড়ী ঘোড়া সব।
সহরের সাজ সজ্জা অতুল বিভব ;
সহরের মহা রোল,
সহরের গণ্ডগোল,
নাহি সেথা স্বার্থপর মানবের রব।

৩

সেথানে এ কিছু নাই—সব স্বতন্তর।
নির্জ্জনতা চারিদিকে বাঁধিয়াছে ঘর।
পুকুরের চারিধারে
বটগাছ শোভা করে
সুমিষ্ট রসাল তরু বাড়ীর ভিতর।

৪

পরিষ্কার পুকুরটী তটে বট গাছ,
সমান সমান তায় জল আর মাছ।
হাত-জালী লয়ে করে
সাঁজ বেলা মাছ ধরে
সরলা কৃষক-বালা সরগের ছাঁচ।

৫

অদূরে হরিৎক্ষেত্রে মৃদুল কিরণ
ধীরে ধীরে স্নিগ্ধকারী বহে সমীরণ।
বাড়ীর পশ্চিমে গাছে
শিরিষ কুসুম আছে
প্রস্ফুটিত সুবাসেতে আকুল জীবন।

৬

ছোট বড় অনেক রয়েছে তরুচয়,
বসন্ত পরশে সবে নব শোভাময়।
সন্ধ্যা বেলা দাঁড়াইয়ে
চারিদিকে নিরখিয়ে
জুড়াইত প্রাণ দেখি নব কিশলয়।

৭

বাড়ীর দুদিকে আছে মাঠ মনোহর।
অন্যদিকে কয়খানি কৃষকের ঘর।
পূর্ব্বদিকে সরোবর
চিরপূর্ণ কলেবর
আনন্দে খেলিছে সেথা কত জলচর।

৮

কিছু দূরে মাঠ মাঝে ঝোপ পারা বন।
বন ফুলে আলো করে রয়েছে এখন।
ভৃত্যবৎ সমীরণ
আমাদের অনুক্ষণ
কুসুম সুরভি লয়ে করিত ব্যজন।

৯

স্নাগে মনে থেকে থেকে সে পুরাণ কথা
মধুর সে ঘ্রাণ পেয়ে বলিতেন পিতা।
'সুশী' মা গো গন্ধ পা'স?
আসিছে কি যে সুবাস,
সুরভি পবন আনে মনে পবিত্রতা।

১০

বট বৃক্ষে কোকিল কোকিলা প্রাণ খুলি,
ডাকে পরস্পরে সুমধুর তান তুলি।
কোকিল বলিছে আয়,
কোকিলাও তাই গায়,
মাতায় জগৎ প্রাণ সুমোহন স্বরে।

১১

হাত ধরাধরি করি দুই বোনে মিলে
বেড়াতায় চারিদিকে কত হেসে খেলে।
শৈশবের সরলতা
শৈশবের পবিত্রতা
শৈশবের স্নেহ মাথা আনন্দেতে গলে।

শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহ।

মরণ।

জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহিনা আর,
কে জানে কেমন কোথা
মরণের পর পার?
এখানে যেমন দুঃখ
সুখও তেমনি আছে,
হৃদয় ডুবিয়া থাক্
অতীত স্মৃতির মাঝে।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মন,
মরণ কি হবে কভু
এমন প্রাণের সম?
অথবা চাহিনা সুখ
হউক দগধ হিয়া,
হৃদয় করিব সুখী
পরসুখ নিরখিয়া।
আসিতে দিবনা কভু
হৃদয়ে পাপের ছায়া,
ভরিব পরাণ টুকু
পরার্থপরতা দিয়া।
জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহিনা আর,
করিব পরাণ ভরি
জগতের উপকার।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি ময়,
মরণ হবে কি কভু
এমন প্রাণের সম?

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।